পৃথিবী পরিচয়

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়





পৃথিবী পরিচয়

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ❋ ৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড



প্রকাশক

রবীন বল, ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ

অলয় ঘোষাল

প্রথম সংস্করণ

জানুয়ারী ১৯৮৮

দাম : দশ টাকা

Acc No-16618

মুদ্রাকর

লীলা ঘোষ

তাপসী প্রিণ্টার্স

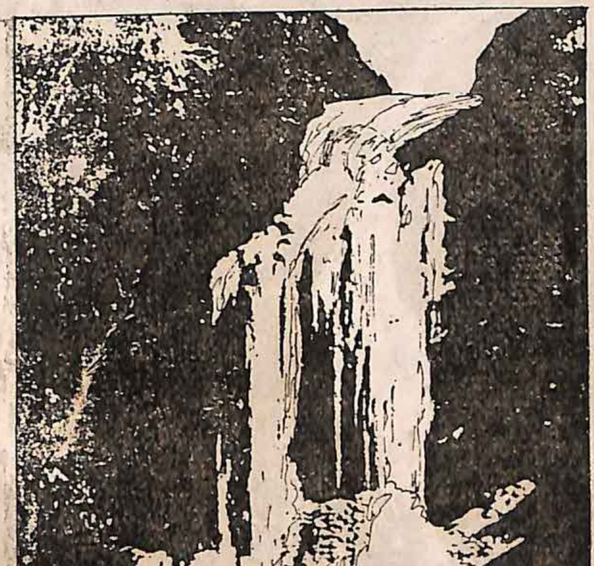
৬, শিবু বিশ্বাস লেন

কলিকাতা-৬

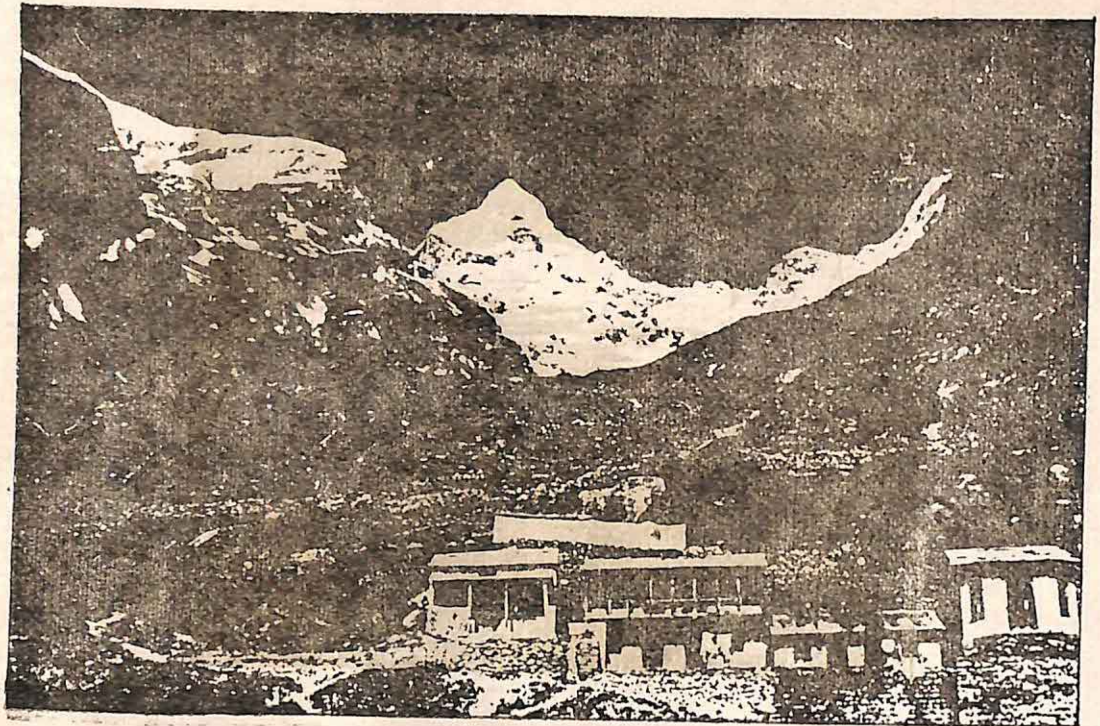
উৎসর্গ

আমার দুই কাকা
প্রয়াত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
প্রয়াত চন্দ্রমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্মৃতির উদ্দেশে

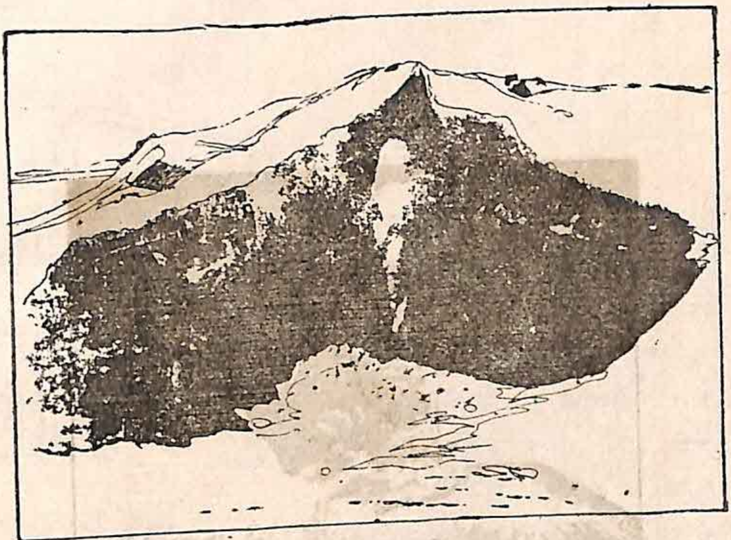
এতে যা আছে



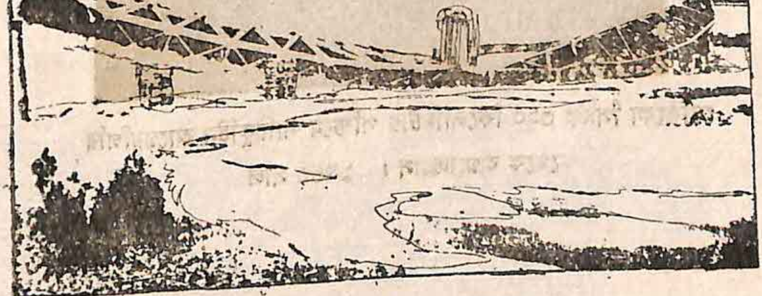
হিমালয়ের একটি জলপ্রপাত ঠাণ্ডায় জমে বরফ।



হিমালয়ের "নীলকণ্ঠ" বদ্রীনাথ



হিমালয় পাহাড়ে বরফের রাজত্ব



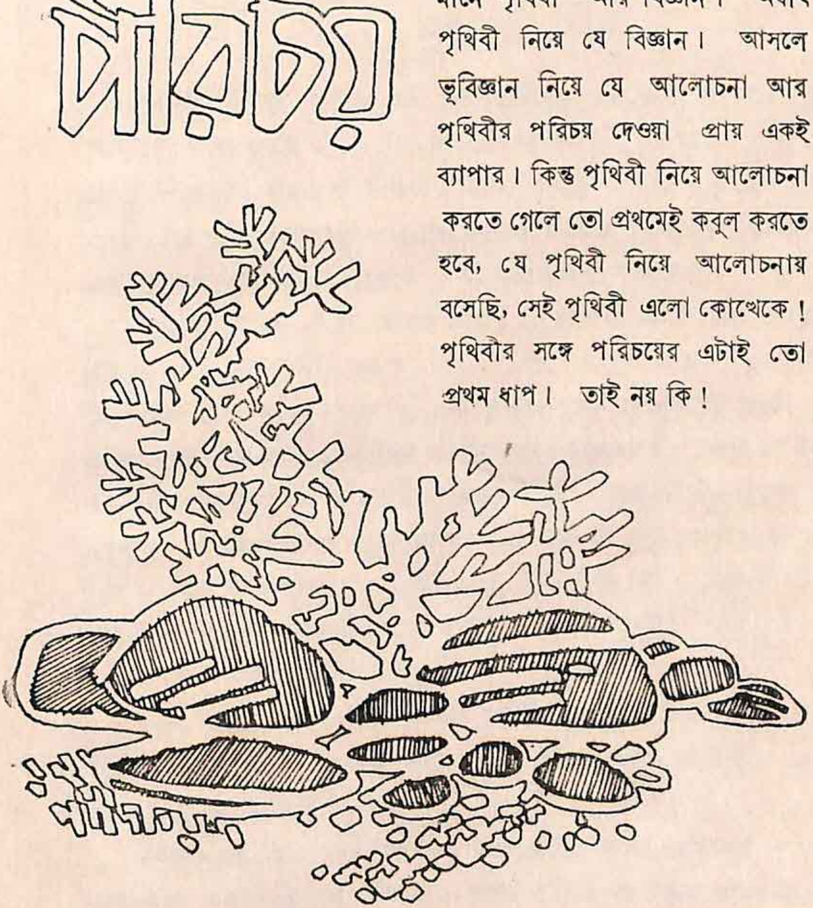
১৯৩৪ সালে বিহার—নেপাল



মেক্সিকো সিটির ৩২০ কিলোমিটার পশ্চিমে পারিকুটিন আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুচ্ছ্বাস। ১৯৪৩ সাল

পৃথিবী পরিচয়

ভূবিজ্ঞান কথাটির মধ্যে দু'টি শব্দ লুকিয়ে আছে। ভূ মানে পৃথিবী—আর বিজ্ঞান। অর্থাৎ পৃথিবী নিয়ে যে বিজ্ঞান। আসলে ভূবিজ্ঞান নিয়ে যে আলোচনা আর পৃথিবীর পরিচয় দেওয়া প্রায় একই ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবী নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তো প্রথমেই কবুল করতে হবে, যে পৃথিবী নিয়ে আলোচনায় বসেছি, সেই পৃথিবী এলো কোত্থেকে! পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়ের এটাই তো প্রথম ধাপ। তাই নয় কি!



এক ঃ পৃথিবীর জন্ম

তোমরা নিশ্চয়ই জানো সেই জ্যোতির্বিদের কথা, যিনি অন্ধকারের মধ্যে আকাশের তারা গুণতে গুণতে পড়ে গিয়েছিলেন এক ইঁদারার মধ্যে। শুধু সেই জ্যোতির্বিদই নয়, আমরা সবাই শীতের নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকালে আজো মশগুল হয়ে পড়ি তারায়-ভরা আকাশের বিশালত্বে। মনে হয় না কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এত সূর্য তারা গ্রহ এলো কোত্থেকে! কী করে জন্ম হলো এদের?

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কী করে তৈরি হলো আমাদের এত পরিচিত সৌরমণ্ডলী—সূর্য ও তার ন'টি গ্রহ? এসব প্রশ্নেরই কি সঠিক উত্তর মিলেছে! সত্যি বলতে কি, এসব প্রশ্ন শুধু আমাদের মনেই জাগে নি, এসব প্রশ্নের উত্তর তালাশ করেছেন প্রাচীনকালের মানুষেরাও। তাই পৃথিবীর জন্ম নিয়ে বহুদিন থেকেই নানারকম রূপকথা চালু রয়েছে। চীন দেশের এক রূপকথায় রয়েছে—অনেক দিন আগে নাকি মাটি জল আর আকাশ এক সঙ্গে ছিল। কিন্তু আকাশ খুব হালকা বলে সেটা ওপরে উঠে গেল। জল আর মাটি পড়ে রইল নিচে। কিন্তু এখন তো আর রূপকথার দিন নেই। তাই সেই সব গল্পকথা কে আর বিশ্বাস করে!

যে সব বিজ্ঞানী ও দার্শনিক পৃথিবীর জন্ম নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা করেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় টাইকো ব্রাহী, কেপলার ও কাণ্টের নাম।

পৃথিবীর জন্ম নিয়ে যেসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে, তাদের মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একদল বিজ্ঞানীর মতে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি

হয়েছে সূর্যের সঙ্গে অন্য কোন নক্ষত্রের সংঘর্ষের ফলে। আরেক দল বিজ্ঞানীর মোদ্দা কথা—সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের সৃষ্টি মহাশূন্যে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও মেঘ থেকে জমাট বেঁধে! মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে মিল থাকলেও তত্ত্বগুলির খুঁটিনাটিতে যথেষ্ট অমিল রয়েছে।

পৃথিবীর উৎপত্তি নিয়ে যত তত্ত্ব বা প্রকল্প রয়েছে, তার মধ্যে প্রাশিয়ান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্টের তত্ত্বই বোধহয় 'সর্বপ্রথম' বলে দাবী করতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (1755) প্রচারিত কাণ্টীয় তত্ত্বের সঙ্গে আধুনিকতম তত্ত্বের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করে সত্যিই অবাক হতে হয়। কাণ্টের মতে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বস্তুই জন্ম নিয়েছে এক সূক্ষ্ম ধূলিকণা জাতীয় বস্তু থেকে। তিনিই প্রথম বলেন, বস্তুর বিবর্তনের মধ্য দিয়েই তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল নানারকম নৈসর্গিক বস্তুর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কাণ্ট বলেছেন, সৌরজগতের উৎপত্তি হয়েছে মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান ধূলিকণা ও ঘন ভান্তঃ (intersteller) মেঘের মিলনের ফলে। সৃষ্টির সেই আদিম পর্বে এই মেঘ ও ধূলিকণার রাশি মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াত আপন খেয়ালে। ক্রমে এই মেঘপুঞ্জ প্রাকৃতিক ঘাত-প্রতিঘাতে সংঘবদ্ধ ও শান্তশিষ্ট বালকের মতো একমুখী হয়ে এলো, উত্তপ্ত গোলকের আকারে মহাশূন্যের বুকে সূর্যের চারপাশে নির্দিষ্ট কক্ষে ঘুরতে শুরু করলো। এদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেঘপুঞ্জ তাপ বিকিরণ করে ক্রমেই ঠাণ্ডা ও সঙ্কুচিত হয়েছে। দার্শনিক কাণ্ট বলেছেন, এর পরে মেঘপুঞ্জের গোলকটির গতিবেগ ও কেন্দ্রাতিগ বলের পরিমাণ বেড়েছে আর ক্রমে তা থেকে জন্ম হয়েছে গোলাকার মালার মতো মেঘের মণ্ডলের। এই মেঘের মণ্ডলগুলি ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি হলো সূর্য ও অন্য গ্রহগুলির। গ্রহগুলি শক্ত নিরেট হবার আগে সেগুলিকে ঘিরে উপগ্রহের সৃষ্টিও হয়েছে প্রায় একইভাবে। এমনিভাবেই একদিন মহাশূন্যের বুকে বিচরণশীল ভান্তঃ মেঘমণ্ডলী থেকে জন্ম হলো সৌরজগতের। অবশ্য বিজ্ঞানীরা সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলেছেন, ভান্তঃ মেঘের উৎপত্তির ব্যাপারে কাণ্টীয় দর্শন নীরব কেন!

একথা সত্যি, মেকানিক্স বা বলবিদ্যার সূত্র অনুযায়ী কাণ্টীয় তত্ত্বকে বেশ গুরুতর সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। যেমন ধরা যাক, সমালোচকরা বলেছেন, বাইরে কোন শক্তির সাহায্য ছাড়া কৌণিক ভরবেগের পরিবর্তন সম্ভব নয়। অথচ, ভান্তঃমেঘের দল থেকে গ্রহমণ্ডলীর উৎপত্তির জন্য পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া বাইরের অন্য কোন শক্তির অংশ গ্রহণের কথা কাণ্টীয় তত্ত্বের

মধ্যে চিন্তা করা হয় নি। তাছাড়া ছড়ানো ছেটানো গতিময় মেঘপুঞ্জের একমুখী হবার পেছনেও যথেষ্ট কারণ দেখানো হয় নি বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

ইমানুয়েল কান্টের সমসাময়িক ফরাসী প্রকৃতিবিদ বুঁফো (Comte de Buffon) আমাদের উপহার দিয়েছিলেন অন্য ধরনের একটি প্রকল্প। তাঁর মতে, মহাকাশে সূর্যের সঙ্গে প্রায় সমান ভরের একটি চলমান ধূমকেতুর সংঘর্ষ হয়েছিল। তিনি কল্পনা করেছেন, সংঘর্ষ হবার পর সূর্য ও ধূমকেতু—এই দু'টি বস্তুপিণ্ড থেকেই ছোটখাট পিণ্ড ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। আর এই ছোট বস্তুপিণ্ডগুলি চলন্ত অবস্থায় সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাবে আটকা পড়ে তার চারদিকে ঘুরতে শুরু করল। বুফোঁর এই প্রকল্পটি সে সময়ে বিজ্ঞানীমহলে যথেষ্ট কৌতূহল সঞ্চার করলেও পরবর্তী সময়ে নানা কারণে পরিত্যক্ত হয়।

কান্টীয় তত্ত্বের সমর্থকদের মধ্যে ফরাসী গণিতজ্ঞ মার্কুইস দ্য লা প্লাস খুবই পণ্ডিত। কিন্তু তিনিও কান্টীয় তত্ত্বকে হুবহু মানতে রাজী ছিলেন না। 1796 সালে কান্টীয় তত্ত্বের ভুলচুকগুলো খানিকটা সংশোধন করে তিনি আর একটি তত্ত্ব পরিবেশন করেন। গণিতজ্ঞদের মূল সমালোচনাকে এড়িয়ে যাবার জন্য তিনি কান্টীয় তত্ত্বের প্রথম অংশটুকু তিনি বাদ দেন। তিনি তাই মহাশূন্যে ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ ভাস্তঃ মেঘমালার পরিবর্তে প্রথম থেকেই একমুখী গতিশীল মেঘের কল্পনা করে কৌণিক ভরবেগের সমাধান করতে চাইলেন। কিন্তু তবু সন্তুষ্ট করা গেল না কট্টর তাত্ত্বিকদের। তাঁরা, বিশেষ করে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বললেন, সৌরজগতের প্রধান চারটি গ্রহের মধ্যে সৌরজগতের শতকরা 98 ভাগ কৌণিক ভরবেগ ছড়িয়ে রয়েছে, যদিও ভরের দিক থেকে এই চারটি গ্রহের ভর সমস্ত সৌরজগতের শতকরা মাত্র 1·5 ভাগ। বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্পেনসার জোন্স কল্পনা করেছেন, সৌরজগতের উৎপত্তির মূলে কাজ করেছে বাইরের কোন প্রচণ্ড শক্তি।

কট্টর সমালোচনার মুখে পড়ে কান্ট ও লা প্লাসের তত্ত্ব কিছুটা ধামাচাপা পড়ে গেল। ফলে কিছুদিনের জন্য আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল সূর্যের সঙ্গে সংঘর্ষভিত্তিক কিছু মতবাদ। 1900 খ্রীস্টাব্দে চেম্বারলেন ও মূলটন আরেকটি নূতন তত্ত্বের কথা শোনালেন। এটি 'গ্রহাণুপুঞ্জ তত্ত্ব'। এই তত্ত্বের সঙ্গে বুফোঁর প্রকল্পের যথেষ্ট মিল। এতে বলা হয়েছে, সুদূর অতীতে সূর্যের সঙ্গে মহাকাশের বুকে ভ্রাম্যমাণ কোন একটি নক্ষত্রের সংঘর্ষে সূর্যের খানিকটা অংশ অসংখ্য

গ্রহাণুপুঞ্জে পরিণত হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সেই গ্রহাণুপুঞ্জ ঠাণ্ডা হয়ে জমে গিয়ে সৃষ্টি হয় সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলীর।



কাণ্ট ও লা-প্লাসের কল্পনায় এভাবেই সৌরমণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছিল

এর প্রায় দু' দশক পরে জিন্স ও জেফারিস গ্রহাণুপুঞ্জ প্রকল্পটিকে মোটামুটি সমর্থন করলেও সূর্যের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনাটি ঠিক মেনে নিতে পারেন নি। সৌরজগৎ সৃষ্টির রহস্য সমাধানে দার্শনিক কাণ্টের সময় থেকেই প্রচুর আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক এবং অনেক তত্ত্ব বা প্রকল্পের উদ্ভব হয়েছে। মূল সমস্যার ওপর মোটামুটিভাবে আলোকপাত হলেও কোন চরম মীমাংসা হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে সাম্প্রতিক কালে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচুর উন্নতির ফলে মহাকাশ, মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ সম্বন্ধে নতুন অনেক কিছুই জানা গেছে। ফলে পুরানো তত্ত্বগুলির ভুলভ্রান্তি দূর করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে সৌরজগৎ সৃষ্টির অনেক নতুন প্রকল্পই হাজির করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক ও যুক্তিপূর্ণ প্রকল্পটি বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ফন ভাইজেকারের।

ফন ভাইজেকার তাঁর প্রকল্পে বলেছেন, কাণ্ট নির্দেশিত পন্থায় সৃষ্টির পর সূর্যের চারিদিকে ছড়ানো ছিল ধূলিকণা ও ভান্তঃমেঘের পুঞ্জ, যার আয়তন সূর্যের আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই ধূলিকণা ও মেঘমালার রাসায়নিক উপাদান সূর্যের মতো, অনেকটাই হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসে তৈরি। ধূলিকণা ও মেঘের আবরণটি মাধ্যাকর্ষণের টানে সূর্যের চারদিকে খানিকটা নিরপেক্ষ কক্ষপথে আবর্তিত হত।

অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ ও নানারকম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্রমেই এই মেঘের আবরণটি গোলাকার থালার আকারে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে চক্রাকার কক্ষপথে। এই আদি মেঘপুঞ্জের থালাটির ব্যাস হাল আমলের সৌরজগতের ব্যাসের সমান। সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রথমদিকে চরম বিশৃংখলার ফলে মেঘপুঞ্জের থালাটি অনেকগুলি গোলাকার বলয়ে ভেঙ্গে যায় ও সমান গতির কণিকাগুলি মিলিত হয়ে পরিমিত আকারের পাঁচটি বলয়াকার আবর্তের সৃষ্টি করে। টিটিয়াস বোডের সূত্র অনুযায়ী পরপর দু'টি কক্ষবলয়ের ব্যাসার্ধের অনুপাত সবসময় সমান হবে। ভাইজেকারের অনুমান, চক্রাকৃতি বলয়ের ভেতরে যে মধ্যবর্তী আবর্ত ছিল, সেগুলি ক্রমে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে গ্রহমণ্ডলীর সৃষ্টি করে। তবে গ্রহের উৎপত্তির ব্যাপারে শেষোক্ত পন্থাটি সম্বন্ধে ভাইজেকার নিজেও পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। গ্রহমণ্ডলীর সৃষ্টির সময় গ্রহগুলির চারদিকে যে মেঘমণ্ডল ছড়িয়ে ছিল, তা' থেকে প্রায় একইভাবে সৃষ্টি হয়েছে উপগ্রহের।

এই গ্রহগুলিতে উদ্বায়ী পদার্থ বা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের পরিমাণ কম এবং সিলিকন ও লোহার পরিমাণ বেশি। কিন্তু তাপমাত্রা কম হওয়ায় ধারের দিকের গ্রহগুলিতে বেশি পরিমাণ উদ্বায়ী (volatile) গ্যাস ও বস্তুপুঞ্জ ঘনীভূত হয়েছে। এরই ফলে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে উদ্বায়ী পদার্থে ভরা বিশাল আকারের কয়েকটি গ্রহ। অ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাসের বরফে ভরপুর এসব গ্রহগুলির আবহাওয়া তৈরি হয়েছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসে।

কয়েক বছর পরে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ জি পি কুইপার (1951) ভুলচুকগুলি সামান্য শুধরে নিয়ে ভাইজেকারের প্রকল্পটি নতুনভাবে পরিবেশন করেন। তাঁর মতে, ধূলিমেঘের থালাটি ভেঙ্গে বেশকিছু বলয় আর বলয়ের মধ্যে বিভিন্ন আকারের মেঘের আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল ঠিকই, তবে ভাইজেকার প্রকল্পের মতো আবর্তের আয়তন একটি বিশেষ মাপের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। কুইপারের মতে, আবর্তগুলি, সূর্য থেকে যে যত দূরে রইল, তার মাপ হলো তত বড়। এইসব আবর্তগুলি ঘুরতে ঘুরতে নিজেদের মধ্যে সংঘাতের ফলে ক্রমশ আকারে বেড়ে যাচ্ছিল। অবশেষে শেষ পর্যায়ে প্রতিটি কক্ষপথে কেবলমাত্র একটি করেই আবর্ত অবশিষ্ট ছিল. যা থেকেই জন্ম হয়েছে গ্রহগুলির। ধূলি-মেঘ থেকে তৈরি এইসব গ্রহের আকার প্রথম দিকে এতই বড় ছিল যে সূর্যের চারদিকে আবর্তনের সময় ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথে থাকলেও পরস্পরের সঙ্গে প্রায়ই মোলাকাৎ এবং সংঘর্ষ ঘটতো। 'রোশ সূত্রে'র ওপর নির্ভর করে উনি মেঘমালার সম্ভাব্য ঘনত্ব, আয়তন

এবং অবস্থান হিসেব করেছেন। ক্রমে মেঘের আবর্তের থেকে গ্যাস বেরিয়ে গেলে অবশিষ্ট পদার্থ থেকে জন্ম হলো গ্রহমণ্ডলীর। গ্যাস বেরিয়ে যাবার ফলে কৌণিক ভরবেগও কমে গেল বেশ খানিকটা আর গ্রহগুলি আগের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ঘুরতে লাগল। কুইপারের এই প্রকল্পে এভাবেই কৌণিক ভরবেগের হেরফেরের সমস্যার আংশিক সমাধান হলো। মেঘমালা থেকে কীভাবে গ্রহগুলির জন্ম হলো, সে আভাসও দিয়েছেন কুইপার, যদিও এ ব্যাপারে তিনি ইউকেনের (1944) তত্ত্বের ওপরই অনেকটা নির্ভর করেছেন। গ্রহের জন্মের প্রাথমিক পর্যায়ে গ্যাস বলয়গুলি পুরোপুরি স্থিতিশীল হতে পারে নি, যদিও তখন তাপ, চাপ ও ঘনত্বের মধ্যে পারস্পরিক সমতা মোটামুটি বজায় ছিল। বলয়টি থেকে গ্যাস বেরিয়ে গেলে সবচেয়ে কম উদ্বায়ী পদার্থগুলি বলয়টির কেন্দ্রীয় অঞ্চলে জমতে শুরু করে আর এর ওপরের স্তরে জমে ওঠে উদ্বায়ী সিলিকেট জাতীয় পদার্থ। এমনিভাবেই পৃথিবীর ওপরের স্তরে সিলিকেট ম্যান্টল (mantle) ও ভেতরে লোহা-নিকেলের অন্তঃস্থল (core) গড়ে উঠেছে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা।

বিখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী হ্যারল্ড সি ইউরি মোটামুটি ভাবে কুইপারের তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করেছেন। যদিও তত্ত্বটির কয়েকটি বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে, তবু সৌরজগতের সৃষ্টিরহস্য অনুধাবন করবার পক্ষে কুইপারের প্রকল্পটি যে সঠিক পথ-নির্দেশ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দুই ঃ পৃথিবীর বয়স

এতক্ষণ তো শুনলে পৃথিবীর জন্মের কথা। এবার তাহলে পৃথিবীর বয়সের কথা। এতো আর মানুষের বয়সের প্রশ্ন নয়, যার উত্তর বড় জোর সত্তর-আশির মধ্যেই হবে। এ হলো খোদ পৃথিবীর বয়সের প্রশ্ন। তোমরা হয়তো উত্তরে বলবে, কত আর হবে, বড় জোর দশ কোটি, বিশ কোটি……। না উত্তর মিলল না। তোমরা যা বললে, তার চেয়ে অনেক বেশি। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ নয়, এই জটিল প্রশ্ন নিয়ে আজকের তামাম বিজ্ঞানীরাও হিমসিম খাচ্ছেন। গত দু'শতক ধরে এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা তর্ক-বিতর্ক চলেছে। তবু বিজ্ঞানীরা স্থির নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারেন নি। একটা কিন্তু থেকে গেছে।

সে যাই হোক ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাই, পৃথিবীর বয়স নিয়ে কেবল বিজ্ঞানীরাই নয়, অনেক অ-বিজ্ঞানীর দলও কম জল ঘোলা করেন নি। মজার ব্যাপার, ইংল্যাণ্ডের আর্কবিশপ ইউসার 1658 সালে হঠাৎ ঘোষণা করলেন খ্রীস্টপূর্ব 4004 সালে নাকি পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। আরো তাজ্জব কাণ্ড, ইউসারের ধারণাকে একটু সংশোধন করে গণনার ব্যাপারে আরো নির্ভুল হতে চাইলেন বিখ্যাত হিব্রু সাহিত্য বিশারদ জন লাইটফুট। ইনি ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যানসেলার। তিনি বললেন, সেই বছরেই 17ই সেপ্টেম্বর স্বয়ং ভগবান নিজের হাতে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করলেন। সেদিন ছিল শুক্রবারের এক সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত। ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় ন'টা। লাইটফুটের কাছে মানব জন্ম আর পৃথিবী জন্মের ব্যাপারটা ছিল একই।

ভাবতে অবাক লাগে, পৃথিবীবিখ্যাত নাট্যকার শেকসপীয়ার পর্যন্ত পৃথিবীর

বয়সের ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকতে পারেন নি। তাঁর একটি নাটকের চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, পৃথিবীর বয়স নাকি প্রায় 600 বছর।

গির্জার পাদ্রী, বিদগ্ধ পণ্ডিত কিংবা নাট্যকারের কথা ছেড়ে দিলেও সে যুগের অনেক বিজ্ঞানী এমন মত পোষণ করতেন, যা শুনলে আমাদের মুখ হাঁ হবে। সে যুগের এক বিজ্ঞানী সোলাস (1905) তো সমুদ্রের নিচে জমে জমে যে স্তর তৈরি হয়েছে, তাই মাপতে শুরু করে দিলেন। প্রতি বছর সমুদ্রের নিচে যে পরিমাণ বালি ও মাটি জমে স্তর তৈরি হয়, তাঁরই ভিত্তিতে এক আনুমানিক মান স্থির করে নিলেন। সোলাসের হিসেব মতো পৃথিবীর বয়স আড়াই কোটি বছরের কিছু বেশি।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন বিশ্বাস করতেন, পৃথিবী ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে জুড়িয়ে আসছে। এই ঠাণ্ডা হয়ে আসার মাত্রা বের করে পৃথিবীর বয়স স্থির করেছেন প্রায় 4 কোটি বছর। কিন্তু ওর হিসেবে একটা ভুল থেকে গেছে। পৃথিবীর শরীরে যে প্রচুর পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে—সেগুলি অহরহ ভেঙ্গে গিয়ে ভূপৃষ্ঠে অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি করছে। অথচ কেলভিনের সমীক্ষায় এই অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারটা ধরা হয় নি। সুতরাং কেলভিনের হিসেবে যে গরমিল থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

আরেক বিজ্ঞানী জলী সমুদ্রজলে নুনের পরিমাণ থেকে পৃথিবীর বয়স অনুমান করার চেষ্টা করেছেন। এতে কল্পনা করা হয়েছে, এমন একদিন ছিল যখন সমুদ্রজল ছিল লবণ মুক্ত। তারপর বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন নদনদী বাহিত হয়ে সমুদ্রজলে নুনের পরিমাণ বেড়েছে। প্রতি বছর সমুদ্রজলে নুনের পরিমাণ কতটা বাড়ে, এই হিসেব থেকে সহজ গাণিতিক নিয়মে পৃথিবীর বয়স হিসেব করা হয়েছে। এই হিসেব মতো পৃথিবীর বয়স বারো কোটি বছর।

জীববিজ্ঞানীর দল আরেক উপায়ে পৃথিবীর বয়স আন্দাজ করার পথ দেখিয়েছেন। পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে প্রাণের প্রথম বিকাশ থেকে বহু বিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষ আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জীববিজ্ঞানীদের মতে প্রাণিজগতে বিবর্তনের একটি সময়ানুপাতিক হার রয়েছে। এই হার থেকেই হিসেব করা হয়েছে, প্রাণের প্রথম বিকাশের সময় প্রায় দশ কোটি বছরের কাছাকাছি। তাই পৃথিবীর বয়স তো এর অনেক বেশিই হবে।

কিন্তু হাল আমলে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করবার নতুন পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ায়, পুরনো সবগুলি তত্ত্বই পরিত্যক্ত হয়েছে। হালফিল জানা গেছে, তেজস্ক্রিয়

পদার্থ অনবরত নিজের শরীর থেকে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি বিকিরণ করে অন্য একটি পদার্থের সৃষ্টি করে। এটাই হলো তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রধান ধর্ম। পৃথিবীর বয়স পরিমাপের কাজে তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই বিশেষ গুণটিকে কাজে লাগানো হয়েছে। এভাবেই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি বিশেষ করে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম বা রেডিয়াম অনবরত ভাঙ্গনের ফলে তেজস্ক্রিয়তাহীন নিষ্ক্রিয় সীসায় পরিণত হয় আর অন্যদিকে সৃষ্টি হয় হিলিয়াম গ্যাসের। পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রায় **1600** বছর পরে এক গ্রাম রেডিয়াম থেকে আধ গ্রাম অবশিষ্ট থাকে। আরো **1600** বছর পরে আধ গ্রাম থেকে সিকি গ্রাম রেডিয়াম অবশিষ্ট থাকবে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। এই ভাঙ্গনের হার স্থানকালের ওপর নির্ভরশীল নয়। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ *যে সময়ে ভাঙ্গনের ফলে ঐ পরিমাণের অর্ধেকে দাঁড়ায় সেই সময়কে ঐ পদার্থের অর্ধজীবনকাল (half-life) বলে।* অবশ্য সব তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধজীবন কাল এক নয়। যেমন, ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে 760 কোটি বছর হলেও, থোরিয়ামের অর্ধজীবন কাল 2,11,000 বছর।

এমনিভাবে তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে পৃথিবীর প্রাচীন যুগের পাথরগুলি পরীক্ষা করে সবচেয়ে পুরনো যে পাথর পাওয়া গেছে, তার বয়স আনুমানিক **398** কোটি বছর। এই পাথরের দেখা মিলেছে গ্রীনল্যাণ্ডে ও ভারতের ওড়িশা রাজ্যে (ডঃ অজিত সাহা, ডঃ সাগরলাল রায়, ডঃ আশিস বসু ও ডঃ সমর সরকার)। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না পৃথিবীর প্রথম পাথর দানা বাঁধবার অনেক আগে থেকেই পৃথিবী ছিল। তবে তরল অবস্থায়। যুক্তিগ্রাহ্য কারণেই ভূ-বিজ্ঞানীরা (যেমন, আরথার হোমস্) বলেছেন, তরল অবস্থা থেকে প্রাচীনতম শিলা গঠিত হবার জন্য পৃথিবীকে অন্ততঃ **50-60** কোটি বছর ধরে শবরীর প্রতীক্ষায় দিন গুণতে হয়েছে। আসলে পৃথিবী বর্ণচোরা আমের মতো ভেতরে বুড়ি থুথুড়ি। কম করেও যে তার বয়স **460** কোটি বছর, একথা জেনে অবাক হবার কিছু নেই।

তিনঃ পৃথিবীর চেহারা

আমরা যে পৃথিবীতে থাকি, তার চেহারাটা কেমন? এই চেহারার রূপটা আগের যুগের মানুষের কাছে ছিল ধোঁয়াটে। কেউ ভাবতেন পৃথিবীটা গোল থালার মতো, আবার কারো কাছে বা চৌকো বাক্সের মতো। সে যাই হোক না কেন, আকাশের বুকে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাঠানো ছবির কল্যাণে আমাদের কাছে পৃথিবীর চেহারা খুবই স্পষ্ট। এ নিয়ে আর কোন তর্কবিতর্ক নেই। তবু পৃথিবী সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাদের জেনে রাখা ভালো, কখন কোথায় কাজে লেগে যায়, কে জানে।

ভূপৃষ্ঠের আয়তন : 51,01,00,500 বর্গ কিমি. (19,69,50,000 বর্গ মাইল)।
স্থলভাগের আয়তন : 14,89,50,900 বর্গ কিমি. (5,75,10,000 বর্গ মাইল)।
জলভাগের আয়তন : 36,11,49,600 বর্গ কিমি. (13,94,40,000 বর্গ মাইল)।

নিরক্ষরেখার পৃথিবীর পরিধি : 40,067 কিমি. (24,902 মাইল)।
উত্তর-দক্ষিণে পৃথিবীর পরিধি : 39,913 কিমি. (24,806 মাইল)।
নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর ব্যাস : 12,757 কিমি. (7,926 মাইল)।
সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব : 14·96 কোটি কিমি.।

আজকাল সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ইউনিটে (**A. U.**) প্রকাশ করা হয় ($1\ A.U. = 1{\cdot}495 \times 10^{11}$ মিটার)।

এতো গেল পৃথিবীর বাইরের চেহারা। কিন্তু তার ভেতরের চেহারাটা কেমন? যে পৃথিবীর কেন্দ্রের গভীরতা প্রায় 4000 মাইলের (6435 কিমি.) কাছাকাছি তার অভ্যন্তরের সব রহস্য মানুষ এখনো উদ্ঘাটন করতে পারে নি।

আর করবেই বা কী করে? পৃথিবীর কেন্দ্রদেশের খবর জানবার তো কোন প্রত্যক্ষ উপায় নেই। পৃথিবীর কেন্দ্রদেশ পর্যন্ত নলকূপ বসাবার চিন্তা স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ পৃথিবীর গভীরতম তেলের (পেট্রোলিয়াম) কূপের গভীরতাও 8—10 কিলোমিটারের বেশি নয়। উপায়ন্তর না থাকায় ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানীরা নানারকম অপ্রত্যক্ষ উপায়ে পৃথিবীর ভেতরের যে খবরাখবর জোগাড় করেছেন, তা' নেহাতই অকিঞ্চিৎকর।

অধিকাংশ ভূবিজ্ঞানী মনে করেন, গলন্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হতে হতে পৃথিবী আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। দুধের সরের মতো পৃথিবীর ওপরে সৃষ্টি হয়েছে একটি স্তর, যাকে বলা হয় ভূত্বক (crust)। বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীর ওপরের স্তর ঠাণ্ডা হয়ে এলেও অভ্যন্তর ভাগ কিন্তু খুবই উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কয়লা বা সোনার খনিতে নামলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে ধারণা করা হয়েছে সাধারণভাবে প্রতি 20 থেকে 100 মিটার গভীরতা বৃদ্ধির ফলে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বেড়ে যায়, কিন্তু শুধুমাত্র গভীরতা নয়, শিলা প্রকৃতির ওপরেও উষ্ণতাবৃদ্ধি নির্ভরশীল। যেমন শক্ত আগ্নেয় (igneous) অথবা পরিবর্তিত (metamorphic) শিলার ক্ষেত্রে উষ্ণতাবৃদ্ধির হার পাললিক শিলার চেয়ে বেশি। আবার যেসব অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি রয়েছে, সেখানে উষ্ণতা বৃদ্ধির হার তো আরো বেশি হবে। তাছাড়া ভূত্বকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ বেশি রয়েছে বলে ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতা বৃদ্ধির মাত্রা ভূ-অভ্যন্তরের তুলনায় বেশি। সুতরাং স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, এই পরোক্ষ প্রমাণ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতার হিসেব নিতান্তই আনুমানিক হতে বাধ্য। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের তাপ কত? এই প্রশ্নের উত্তরে ভূবিজ্ঞানী ভেরহুগেন বলেছেন, কেন্দ্রস্থলের ওপরের তাপমাত্রা 1500 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। অবশ্য গুটেনবার্গ, ড্যালি, অ্যাডমস্, জেফরি বা হোমসের মতে এই তাপমাত্রা অনেক বেশি। প্রায় 4000 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে সম্প্রতি (1987) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একদল বিজ্ঞানী বলেছেন, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের তাপমাত্রা প্রায় 6880 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই মতের অমিল খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই তাপমাত্রার পরিমাপ নিছক বৈজ্ঞানিক ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। আর সেই কারণে এ সম্পর্কে চুলচেরা গবেষণা আপাতত নিরর্থক।

গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে শুধু তাপমাত্রাই নয়, চাপের পরিমাণও অনেক বেড়ে যায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, পৃথিবী পৃষ্ঠের এক মাইল নীচে চাপ,

প্রতি বর্গফুট জায়গায় প্রায় 450 টনের কাছাকাছি। এই গড় হিসেব থেকে কেন্দ্রে চাপের পরিমাণ ধরা হয়েছে, প্রতি বর্গফুটে প্রায় 20 লক্ষ টনের কাছাকাছি। আর একটি হিসেব অনুযায়ী, কেন্দ্রে চাপের প্রায় 40 লক্ষ অ্যাটমসফিয়ার। সম্প্রতি (1987) একদল আমেরিকান বিজ্ঞানী হিসেব কষে দেখিয়েছেন, কেন্দ্রে চাপের পরিমাণ প্রতি 6·5 বর্গ সেন্টিমিটারে 22,000 মেট্রিক টন। কোনটা সত্যি, কে জানে!

পৃথিবীর গভীরে তাপ ও চাপের প্রাবল্য থেকে স্বভাবতই অন্তঃস্থলের প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন পদার্থ ই আয়তনে বৃদ্ধি পায়, আবার অন্যদিকে চাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে পদার্থের আয়তন কমে যায়। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রাঞ্চলে অতিরিক্ত চাপ ও তাপ দুই বিরোধী শক্তি একই সঙ্গে কাজ করছে। ফলে পৃথিবীর অন্তঃস্থলের পদার্থ অকঠিন অথচ অতরল অবস্থায় বিরাজ করছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

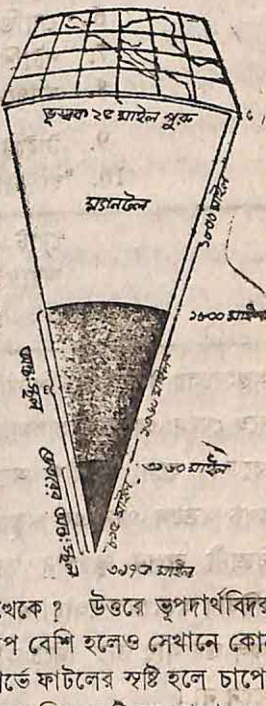
পৃথিবীতে যে ধরনের শিলা দেখতে পাওয়া যায় তার গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) প্রায় তিনের কাছাকাছি। অথচ পুরো পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচ। স্বাভাবিক কারণেই ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভূ-অভ্যন্তরে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই আরো বেশি, হয়তো সাত বা আটের কাছাকাছি। কিন্তু শুধুমাত্র চাপের প্রভাবে পদার্থের ঘনত্বের এতটা পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর অন্তঃস্থল নিশ্চয়ই কোন ভারী ধাতব পদার্থে তৈরি। মহাকাশের বুক থেকে ছুটে আসা উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেগুলিও মোটামুটি লোহা ও নিকেলজাতীয় পদার্থে তৈরি। একথা তো জানাই, বেশির ভাগ উল্কাপিণ্ডই সৌরজগতের মৃত বাসিন্দা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে বাইরের অংশটুকু জলেপুড়ে শেষ হয়ে যায়, পড়ে থাকে শুধু ভেতরের লোহা ও নিকেলের মিশ্র অংশটুকু। একই সৌরজগতের অংশ বলে উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে পৃথিবীর মিল থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তাই পৃথিবীর অন্তঃস্থল লোহা ও নিকেলের তৈরি—বিজ্ঞানীদের এই অনুমান পৃথিবীর চৌম্বক শক্তিকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছে সহজেই।

পৃথিবীর গর্ভের আকৃতি ও প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানীদের মূলত নির্ভর করতে হয়েছে (earthquake)-জনিত তরঙ্গের গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণের ওপর, যদিও তরঙ্গের বিশ্লেষণের ব্যাপারে বিজ্ঞানী মহলে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। নিস্তরঙ্গ জলে ঢিল ছুঁড়লে জলের ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিভবেই

ভূকম্পনজনিত তরঙ্গমালা উৎসস্থল থেকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর সেইসব তরঙ্গ অনেকটা ক্যামেরার ছবির মতো সিসমোগ্রাফ (seismograph) যন্ত্রে ধরা পড়ে। যন্ত্রে ধরা পড়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে চলবার সময় মাঝে মাঝে তরঙ্গবেগের পরিবর্তন ঘটে। এই গতিবেগের তারতম্য থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও গভীরতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

ভূকম্পনতরঙ্গের তিনটি পর্যায় থেকে পৃথিবীর তিনটি স্তরের কল্পনা করা হয়েছে। যেমন, সবচেয়ে ওপরের স্তরের নাম ভূত্বক (crust, গড় গভীরতা 40 কিলোমিটার) মধ্যবর্তী স্তরের নাম ম্যানটল (mantle, গভীরতা 2900 কিলোমিটার ও সবচেয়ে নিচের স্তরের নাম অন্তঃস্থল (core), যা পৃথিবীর কেন্দ্র (centre) পর্যন্ত প্রসারিত। অনেক বিজ্ঞানীর মতে অন্তঃস্থলের পদার্থ-গলিত অবস্থায় রয়েছে, যদিও এ বিষয়ে কিছু কিছু বিজ্ঞানীর সন্দেহ থেকেই গেছে।

একথা তো আগেই বলেছি, পৃথিবীকে শামুকের খোলার মতো ঘিরে যে কঠিন স্তরটি বিরাজ করছে, তার নাম ভূত্বক। গড় গভীরতা প্রায় 40 কিলোমিটার (25 মাইল)। এই ভূত্বকের আবার দুটি ভাগ। ওপরের অংশ লিথোস্ফিয়ার (lithosphere), এতে সিলিকা আর অ্যালুমিনিয়ামের ভাগ বেশি। নিচের অংশ আসথেনোস্ফিয়ার (astheno-sphere)। এতে সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ বেশি।



কোন কোন ভূবিজ্ঞানী কল্পনা করেছেন, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 40 কিলোমিটার নিচেই রয়েছে গলিত লাভার স্তর। কিন্তু ভূপদার্থবিদরা এই ধারণাকে অমূলক বলে অভিহিত করেছেন। কারণ সেরকম কোন গলিত লাভার স্তর থাকলে ভূকম্পন তরঙ্গের গতিবেগে তারতম্য ঘটতো। তাই অনেকেই পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন, তবে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের সময় গলিত লাভা (lava) আসে কোত্থেকে ? উত্তরে ভূপদার্থবিদরা বলেছেন, 40 কিলোমিটার গভীরতায় শিলার উত্তাপ বেশি হলেও সেখানে কোন গলিত শিলাস্তর নেই। হয়তো কোন কারণে শিলাগর্ভে ফাটলের সৃষ্টি হলে চাপের পরিমাণ কমে যায়। আর তখন ভূগর্ভের শিলা গলে গিয়ে সৃষ্টি হয় লাভার।

ভূত্বকের নিচে রয়েছে ম্যানটল—এটি 2900 কিলোমিটার (1800 মাইল) গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। বিখ্যাত ভূ-রসায়নবিদ গোল্ডস্মিথের মতে, ম্যানটলেরও দু'টি ভাগ। ওপরে এক্লোগাইট স্তর, নিচে অক্সাইড সালফাইড স্তর। এই স্তর দু'টিতে অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, লোহা ও নিকেলযুক্ত পদার্থ রয়েছে। এই স্তরটির আপেক্ষিক গুরুত্ব 4 থেকে 5-এর মধ্যে। পেঁয়াজের ভেতরে কোয়ার মতো পৃথিবীরও রয়েছে অন্তঃস্থল। এটি ভূত্বক বা ম্যানটলের চেয়ে ভারী পদার্থে গঠিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি মূলত লোহা, নিকেল ইত্যাদি ভারী পদার্থে তৈরি। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, ম্যানটলের সঙ্গে

ভূত্বকে যে দশটি মৌলিক পদার্থ বেশি রয়েছে

1.	অক্সিজেন	46·60%
2.	সিলিকন	27·72%
3.	অ্যালুমিনিয়াম	8·13%
4.	লোহা	5·00%
5.	ক্যালশিয়াম	3·63%
6.	সোডিয়াম	2·83%
7.	পটাশিয়াম	2·59%
8.	ম্যাগনেশিয়াম	2·09%
9.	টাইটেনিয়াম	0·44%
10.	হাইড্রোজেন	0·14%
	মোট	99·17%
	অন্যান্য পদার্থ	0·83%

(ভূরসায়নবিদ ব্রায়ান ম্যাসনের তালিকা অনুযায়ী)

অন্তঃস্থলের পদার্থের বেশি অমিল নেই। একথা আগেই বলা হয়েছে, গভীরতার সঙ্গে যেমন একদিকে তাপমাত্রা বাড়ে, অন্যদিকে তেমনি চাপের তীব্রতাও যায় বেড়ে। ফলে পৃথিবীর অন্তঃস্থলের অবস্থা অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মতো। অকঠিন অথচ অতরল এমন এক অদ্ভুত অবস্থায় রয়েছে অন্তঃস্তলের পদার্থ। বিখ্যাত বিজ্ঞানী বুলেন ভূকম্পন তরঙ্গের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে একটি তত্ত্বে বলেছেন, পৃথিবীর অন্তঃস্তলে লোহা ও নিকেলের দুটি স্তর। 2900 কিলোমিটার পর্যন্ত তরল স্তর আর তার নিচে কঠিন স্তর। তবে সব ভূবিজ্ঞানী এ তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না।

চার ঃ চলমান মহাদেশ

চলমান জাহাজ নয়, এমন কি চলমান হিমশৈলও নয়, এ হলো চলমান মহাদেশের কথা। যে মহাদেশকে আমরা আবহমানকাল ধরে স্থাবর সম্পত্তির মতো অচল অনড় বলে মনে করে আসছি, তার সম্বন্ধে এমন উদ্ভট কথা শুনলে আঁতকে ওঠবারই কথা। কিন্তু অবিশ্বাস আর সংশয়ে ভুরু কুঁচকে এলেও কথাটা সত্যি যে, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে বিশ্বের তাবৎ জিনিসের মতো মহাদেশগুলিও ঘুরে বেড়াচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। অবশ্য খুবই ধীরে, এত ধীরে যে মানুষের পক্ষে সাধারণভাবে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

মহাদেশগুলি যে অচল নয়, চিরকালই সচল, এই তত্ত্বটি জারমান বিজ্ঞানী ওয়েগনারের (1880—1930)। এই তত্ত্বটি 1912 সালের। তবে মহাদেশগুলি যে চলমান, এমন ধারণা ওয়েগনারের আগেও কোন কোন বিজ্ঞানী প্রকাশ করেছেন। খুব সম্ভবত ইংরেজ লেখক ও দার্শনিক ফ্রানসিস বেকনই প্রথম আটলানটিক মহাসাগরের দু'পারের মহাদেশগুলির তটরেখার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। 1920 সালে একটি প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেন তটরেখার মধ্যে এই সাদৃশ্য নেহাত আকস্মিক নয়। জারমান প্রকৃতিবিদ আলেকজাণ্ডার ফন হামবোল্ট 1800 সাল নাগাদ একটি প্রবন্ধে বলেন, আটলানটিকের দু'পারের মহাদেশগুলি খুব সম্ভবত সংযুক্ত ছিল, পরে সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় দূরে সরে যায়। এছাড়া আমেরিকান বিজ্ঞানী টেলর ও ফরাসী ভূবিজ্ঞানী স্নাইডারও চলমান মহাদেশের কথা বলেছেন। তবু 'চলমান মহাদেশ' তত্ত্বটির মূল প্রবক্তা হিসেবে ওয়েগনারকেই স্বীকার করা হয়। কারণ, তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক

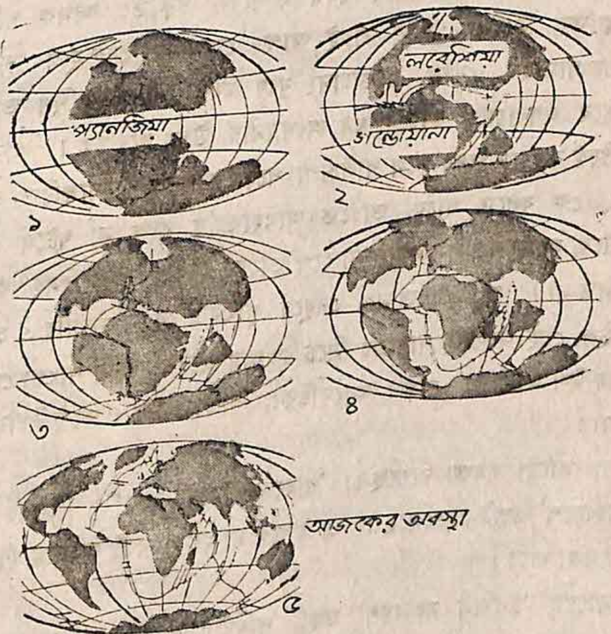
দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিতর্কের সাহায্যে সাধারণভাবে তত্ত্বটির ভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তবু এই তত্ত্বটির উপস্থাপনায় বেশ কিছু যুক্তির ফাঁক ছিল। তাই পরবর্তীকালে ডু-টয়েট এই তত্ত্বটির সামান্য ভুলভ্রান্তি সংশোধন করতে চেষ্টা করেন। অতীতে সংশয় প্রকাশ করলেও সম্প্রতি রাশিয়ান ভূবিজ্ঞানীরাও চলমান মহাদেশ প্রকল্পটিকেও মোটামুটিভাবে গ্রহণ করেছেন। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা 'প্লেট টেকটনিকস' (**plate tectonics**) তত্ত্বের আদলে এই প্রকল্পের সোজা কথাগুলি মেনে নিয়েছেন।

পৃথিবীর মানচিত্র পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সাতটি মহাদেশ—এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আণ্টার্কটিকা মহাদেশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, কেবলমাত্র এশিয়া ও ইউরোপ ছাড়া। কিন্তু চিরদিন এমনটি ছিল না। আজ থেকে অনেক বছর আগে, ধরা যাক প্রায় পঁচিশ কোটি বছর আগে পারমিয়ান (**Permian**) যুগে পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশগুলি মিলে একান্নবর্তী পরিবারের মতো এক বিরাট মহাদেশ ছিল। সেই বিরাট প্রাগৈতিহাসিক মহাদেশের নাম প্যানজিয়া (যার অর্থ স্থলভাগ) আর তাকে ঘিরে ফিরোজা নীল সমুদ্র প্যানথালসা (যার অর্থ আদি সমুদ্র)। কিন্তু সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে ঘর করা বোধহয় প্রকৃতির ধর্ম নয়। তাই বিরাট প্রাগৈতিহাসিক মহাদেশে একদিন ভাঙ্গনের ঢেউ লাগল। ফাটল ধরল একান্নবর্তী প্যানজিয়া মহাদেশে।

এক মহাদেশ ভেঙ্গে বহু মহাদেশ গঠনের চিন্তা বা মননের পেছনে যুক্তি রয়েছে যথেষ্ট। প্রথমত সাদৃশ্যগত মিল। দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বের তটরেখা আফ্রিকার পশ্চিম তটরেখার সঙ্গে খাপ খাপে মিলে যায়। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকার পূর্বতট ও ইউরোপের পশ্চিম তট সম্পর্কেও একই কথা। শুধুমাত্র তটরেখার মিলই নয়, পাহাড় পর্বতের অবস্থান, তাদের ভূতাত্ত্বিক উপাদানে পর্যন্ত আশ্চর্য মিল। শুধুমাত্র এই মিলগুলো লক্ষ্য করেই বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট থাকেন নি, খুঁজে বের করেছেন আরো অনেক তথ্য। যেমন, পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে বিভিন্ন যুগের আবহাওয়ার মধ্যে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটেছিল। বিজ্ঞানী মহলে অনেকের ধারণা, আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি বছর আগে কারবনিফেরাস যুগের প্রথমদিকে হয়তো ভারতবর্ষ ছিল মেরুপ্রদেশের মতো তুহিন হিমশীতল। আর তার স্বাক্ষর থেকে গেছে সে যুগের শিলার বুকে যা থেকে বিজ্ঞানীরা বেশ কিছুটা প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলেছেন, পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের

অবস্থান যুগে যুগে পালটেছে প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে। অর্থাৎ কথাটা ঘুরিয়ে বলা যায়, মহাদেশগুলি যুগে যুগে নিজেদের অবস্থান বদলেছে, কখনো মেরুপ্রদেশের কাছাকাছি, কখনো বা দূরে। পরোক্ষভাবে বলা চলে, পৃথিবীর মহাদেশগুলি চলমান, অনড় তো নয়ই।

যা বলছিলাম, প্যানজিয়া মহাদেশে ফাটল ধরবার ফলে সেটি কয়েকটি খণ্ডে (**plate**) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তারপর বিচ্ছিন্ন অংশগুলি একে অন্যের থেকে দূরে সরতে লাগল ধীরে ধীরে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই ভাঙ্গন শুরু হয়েছে সম্ভবত ট্রায়াসিক (**Triassic**) যুগে, আজ থেকে প্রায় কুড়ি কোটি বছর আগে। তারপর ইয়োসিন (**Eocene**) যুগে, 6 কোটি বছর আগে বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলি আরো দূরে সরে গেল। এবারে একে অন্যের চেয়ে বেশ খানিকটা দূরে। এবং প্লায়াস্টোসিন (**Pleistocene**) যুগে, মাত্র দশ লক্ষ বছর আগে মহাদেশগুলি মোটামুটি আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। অবশ্য এখনো ভ্রাম্যমাণ মহাদেশগুলি থেমে নেই, একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ, তবে অতি ধীরে। যেমন করে সকলের অলক্ষ্যে পৃথিবীর বুকে ঝড়ে পড়ে একটি শিশিরের কণা।



মহাদেশগুলি ভাঙ্গছে কেন? কথায় বলে, ঘরের শত্রু বিভীষণ। তাই

ওয়েগনার বলেছেন, মহাদেশের ভাঙ্গন আর চলনের ব্যাপারে মদত যুগিয়েছে পৃথিবীর নিজেরই শক্তি। প্রথমত, পৃথিবী ঘোরবার ফলে তৈরি হচ্ছে যে কেন্দ্রাতিগ শক্তি (centrifugal force) সেই শক্তি মহাদেশগুলিকে ঠেলে দিয়েছে বিষুবরেখার দিকে, দ্বিতীয়ত জোয়ার ভাটার শক্তি যা মহাদেশগুলির গতি পশ্চিমমুখী করেছে। অবশ্য এই শক্তির ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছেন, যে শক্তিগুলির কথা বলা হয়েছে, তাতে এত বড় একটা মহাদেশকে ভেঙ্গেচুরে টুকরো টুকরো করে এতদূরে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। গাণিতিক সূত্র অনুযায়ীই অসম্ভব। বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী ড্যালি তাই বলেছেন, মহাদেশ ভাঙ্গনের পেছনে মূল শক্তি আসলে মাধ্যাকর্ষণ।

চলমান মহাদেশ তত্ত্বটি আপাতদৃষ্টিতে যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক না কেন, এর সাহায্যে কিন্তু অনেক ভূতাত্ত্বিক সমস্যা মেটানো সম্ভব হয়েছে। প্রথমত, পৃথিবীর মহাদেশগুলিতে কেমন করে আবহাওয়ার বদল হলো, সেকথা তো আগেই বলা হয়েছে। আরেকটি কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বনজ উদ্ভিদের প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। আর তারই স্বাক্ষর থেকে যায় সেই যুগের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের পাতায়। যেমন, গণ্ডোয়ানা যুগে মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষে জলবায়ুগত কারণে ঘন অরণ্যানীর উদ্ভব হয়েছিল। আর সেই বনজ উদ্ভিদই বড় বড় হ্রদের জলে পলিচাপা পড়ে কালক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে কয়লায়। কে বলতে পারে, ভারতে আবহাওয়ার বদল না ঘটলে কিংবা পরোক্ষভাবে, মহাদেশগুলি চলমান না হলে ভারতে হয়তো কোনদিনই কয়লার সন্ধান মিলত না। শুধু ভারতে নয়, সেযুগে পৃথিবীর যে যে জায়গায় ঐ ধরনের জলবায়ু ছিল, সেই অঞ্চলেই পাথরের নিচে কয়লার স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আন্টার্কটিকা ও অস্ট্রেলিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া আরো সমস্যা রয়েছে। 'পাহাড় কী করে হলো'? প্রশ্নের উত্তর 'চলমান মহাদেশ' তত্ত্বটি বাতলেছে। এ প্রসঙ্গে না হয় পরবর্তী অধ্যায়ে দীর্ঘতর আলোচনা করা যাবে।

ওয়েগনারের 'চলমান মহাদেশ' তত্ত্বটি পৃথিবীর আকৃতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান করলেও নানা কারণে বিজ্ঞানীমহলে সমাদৃত ছিল না।

তবে এ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা-আলোচনা কখনোই থেমে থাকে নি। তাই ষাটের দশকে এই তত্ত্বটির কিছু ভুলভ্রান্তি সংশোধনের পর জন্ম হলো নতুন একটি তত্ত্বের। নাম 'প্লেট টেকটনিকস' (**plate tectonics**), যার কথা একটু আগেই বলা হয়েছে। তত্ত্বটির নামী প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন আমেরিকান বিজ্ঞানী আর এস ডিয়েটস্ ও জে সি হোলডেন।

চলমান মহাদেশ তত্ত্বে কল্পনা করা হয়েছে, পৃথিবীর মহাদেশগুলি সমুদ্রতলের ওপর দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যাচ্ছে। কিন্তু 'প্লেট টেকটনিকস' তত্ত্বে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র মহাদেশ নয়, মহাদেশ ও সমুদ্রও একই পাতের অঙ্গ হিসেবে চলমান অবস্থায় রয়েছে। আসলে ভূপৃষ্ঠ কয়েকটি ছোট বড় পাত (**plate**) মিলিয়ে তৈরি, যার মধ্যে শুধু মহাদেশ নেই, আছে সমুদ্রতলের অর্থাৎ ম্যানটলের (**mantle**) ওপরের ভাগও। ভূপৃষ্ঠের এই পাতগুলি প্রায় **100** কিলোমিটার (60 মাইল) পুরু। এগুলি ম্যানটলের অ্যাসথোনোস্ফিয়ারের (**asthenosphere**) ওপর দিয়ে বিশালাকায় জাহাজের মতো ভাসছে ও চলছে।

পাঁচ ঃ পাহাড় পর্বত

পৃথিবীর বুকে পাহাড় কী করে হলো, পাহাড় কেনই বা উঁচু, এ নিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে পাহাড়ের নানা পার্থক্য ধরা পড়েছে। পাহাড়ের উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করে, ভূবিজ্ঞানীরা মোট পাঁচ রকমের পাহাড়ের কথা বলেছেন।

প্রথম ধরনের পাহাড়ের মধ্যে আছে হিমালয়, আল্পস, রকিজ কিংবা আন্দিজ পাহাড়ের মতো বড় বড় পাহাড়। এ ধরনের পাহাড়ের নাম ভঙ্গিল পর্বত (fold mountain)। নাম শুনে মনে হতে পারে, এসব পাহাড়ের মধ্যে নির্ঘাত কোন ভাঙ্গাভাঙ্গির ব্যাপার আছে। সত্যিই আছে। সমুদ্রের নিচে পলি জমে ক্রমে যে পাললিক শিলাস্তর (sedimentary rocks) গড়ে ওঠে, দামাল প্রকৃতির নানা শক্তির চাপে সেই শিলাস্তরে ভাঁজ পড়ে ক্রমেই তা পাহাড়ের চেহারা নেয়। ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করে বলা দরকার। একটা বড় কাগজ হাতে নিয়ে, সেটাকে কয়েকবার ভাঁজ করতে করতে দেখা যায়, পাতলা কাগজটাই বার কয়েক ভাঁজের পরে বেশ মোটা হয়ে উঠেছে। অনেকটা এভাবেই বেশ কয়েকবার ভাঁজ পরে পাথরের স্তর মোটা আর উঁচু হয়ে ওঠে। তবে কাগজের ভাঁজের সঙ্গে একটা ব্যাপারে অমিল আছে। কাগজটা ভাঁজ করতে যেখানে মাত্র দু'তিন মিনিট লাগছে, সেখানে একটা ভঙ্গিল পর্বত তৈরি করতে দু'তিন কোটি বছরও লেগে যেতে পারে।

দ্বিতীয় ধরনের পাহাড় চ্যুতি পর্বত বা স্তূপ পর্বত (block mountain), যার জন্ম চ্যুতির ফলে। সমতলভূমি থেকে কোন পাথুরে অংশ ফাটল বরাবর ঠেলে বেরিয়ে এসে কিংবা নিচে বসে গিয়ে তৈরি হতে পারে এ ধরনের পাহাড়।

গুজরাতের আরাবল্লী পর্বত কিংবা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সিয়েরা নেভাদা পর্বত এই জাতের। আরাবল্লীকে ভঙ্গিল পর্বতও বলা যায়।

তৃতীয় জাতের পাহাড় গম্বুজ পর্বত (dome mountain)। নামের মতো চেহারাও জমকালো, গম্বুজের মতো। এই গম্বুজ আকারের পাহাড়ের ঢাল কেন্দ্রবিন্দু থেকে সবদিকে ছড়ানো। আসামের কিছু কিছু পাহাড় আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওজার্ক পাহাড় এই ধরনের।

চতুর্থ ধরনের পাহাড়ের জন্ম আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে। গলন্ত লাভা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে পাহাড় তৈরি হয়। তাই এই পাহাড়ের নাম আগ্নেয়পর্বত (volcanic mountain)। পশ্চিমবঙ্গ-বিহারের রাজমহল পাহাড়, পশ্চিম ভারতের ডেকান মালভূমি, ইতালির ভিসুভিয়াস কিংবা জাপানের ফুজিয়ামা এই জাতের।

এবার পাঁচ নম্বর পাহাড়ের কথা। উঁচু মালভূমি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানারকম প্রাকৃতিক শক্তি জল-হাওয়া-রোদ ইত্যাদির একটানা পিটুনিতে ক্ষয়ে যায়। এভাবেই ক্ষয়জাত পাহাড়ের (residual mountain) জন্ম। ছোটনাগপুর অঞ্চলের ছোট বড় মাঝারি বেশ কিছু পাহাড় কিংবা মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যপর্বত যে এই ক্ষয়জাত পর্বতের দলেই, সেকথা বলা চলে। কেন, কীভাবে তৈরি হলো পৃথিবীর পর্বতমালা বিশেষত ভঙ্গিল পর্বতমালা, তা' বোঝানোর জন্য ভূবিজ্ঞানীরা আমাদের উপহার দিয়েছেন বেশ কয়েকটি তত্ত্ব।

এরকমই একটি তত্ত্বের নাম সংকোচন তত্ত্ব (contraction theory)। এই তত্ত্বের সারকথা এইরকম। জন্মের সময় পৃথিবী ছিল ফুটন্ত তরল গোল বলের মতো। ক্রমে সেই উত্তপ্ত গোলাকার পিণ্ডটি ঠাণ্ডা হতে হতে তার ওপরে তৈরি হলো ফলের খোসার মতো ভূত্বক। ভূত্বক তৈরি হলেও, ভূত্বকের নিচে তরল শিলারাশির ঠাণ্ডা হওয়া থামে নি। সেগুলি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ক্রমেই আকারে ছোট হয়ে আসছিল। এই সংকোচন বা ছোট হওয়ার ফলে বাইরের ভূত্বকে কুঁচকে গিয়ে ভাঁজ পড়েছে।

আর একটা তত্ত্ব আবহবিদ ও ভূবিজ্ঞানী আলফ্রেড ওয়েগনারের। ওই জারমান ভদ্রলোকের নেশা ছিল মানচিত্র দেখা। রাতদিন মানচিত্র দেখতে দেখতে একদিন ওরও মনে হলো, পৃথিবীর মহাদেশগুলি বোধহয় একসঙ্গে জোড়া ছিল। পরে ছিড়েখুঁড়ে খণ্ড খণ্ড অংশগুলি অর্থাৎ মহাদেশগুলি আজকের চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে। তবে একথা ওরই প্রথম মনে হয় নি, ওর আগে আরো অনেকেরই মনে হয়েছিল, সেকথা তো আগেই বলা হয়েছে। 1912

সালে আলফ্রেড ওয়েগনার বললেন, খুব সম্ভবত আজ থেকে প্রায় কুড়ি কোটি বছর আগে মেসোজয়িক যুগের গোড়ার দিকে প্যানজিয়া মহাদেশ ভেঙ্গে গিয়ে চলতে শুরু করে। তবে চলার গতি খুবই কম। বছরে কয়েক ইঞ্চির বেশি নয়। সেই সময় প্যানজিয়া মহাদেশের ভেতরে টেথিস নামে লম্বা চেহারার একটি সমুদ্র ছিল। ওদিকে যেমন আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ছিঁড়ে দূরে চলে যাচ্ছিল, এদিকে তেমনি টেথিস সমুদ্রের দুপাশের দুটি মহাদেশের বিপরীতমুখী গতি ছিল পরস্পরের দিকে। দুপাশ থেকে দুটি বিপরীত দিকে চলমান মহাদেশের চাপের ফলে টেথিস সাগরের পলি থেকেই তৈরি হয়েছে দীর্ঘ আল্পস ও হিমালয়ের মতো ভঙ্গিল পর্বতমালা। এই পাহাড়গুলি যে একদিন সমুদ্রের নিচে ছিল, তার মোক্ষম প্রমাণ, এই পাহাড়গুলির পাথরে সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে। আর আজকের ভূমধ্যসাগর বোধহয় সেই অতীতের টেথিস সাগরের স্মৃতি বহন করছে।

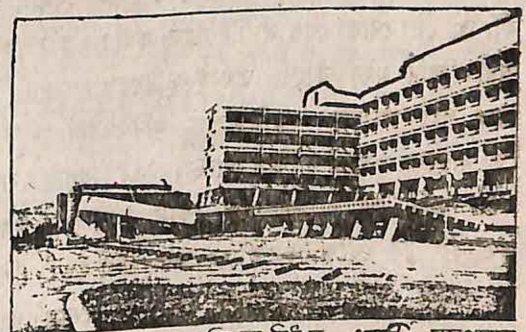
আর একটা কথা, পাহাড় কিন্তু শুধু মহাদেশের ওপরেই নেই, রয়েছে নীল সমুদ্রের জলের নিচেও। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে সমুদ্রতলদেশের মানচিত্র তৈরি করে দেখা গেছে, নীল সাগরের ঢেউয়ের তলায় লুকিয়ে আছে আর একটা পাহাড়ের দেশ, যার কথা বহুদিন ছিল আমাদের অগোচরে।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু দশটি পর্বতশৃঙ্গ

নাম	কোথায় রয়েছে	কতটা উঁচু
মাউন্ট এভারেস্ট	নেপাল / তিব্বত	8,848 মিঃ
গডউইন অষ্টেন (কে 2)	জম্মু / কাশ্মীর	8,611 মিঃ
কাঞ্চনজঙ্ঘা	নেপাল / সিকিম	8,594 মিঃ
লোটসে	নেপাল	8,511 মিঃ
মাকালু	নেপাল / তিব্বত	8,481 মিঃ
ধৌলাগিরি	নেপাল	8,172 মিঃ
মানসলু	নেপাল	8,156 মিঃ
চো ওয়ু	নেপাল	8,153 মিঃ
নাঙ্গা পর্বত	পাক-অধিকৃত জম্মু-কাশ্মীর	8,126 মিঃ
অন্নপূর্ণা	নেপাল	8,078 মিঃ

ছয় ঃ ভূমিকম্প

বেশিদিন আগের কথা নয়। তারিখটা 19শে সেপ্টেম্বর 1985। সেদিন মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুরু হয়েছিল এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প। মাত্র একদিনের বিরতির পর আবার ভূমিকম্প। এবারের তীব্রতা আরো বেশি। মাত্র দু'দিনের ভূমিকম্পে উচ্ছল মেক্সিকো শহর এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত। খানা-খন্দে ভর্তি রাস্তার দুপাশে ধসে-পড়া অট্টালিকার অবশেষ, আগেকার সারিবদ্ধ কুটিরগুলির ভূতলশায়ী রূপ এবং রাস্তা জুড়ে উপ্ড়ে পড়া বৃক্ষরাজি এক মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা ছড়িয়েছে। তার সঙ্গে আকাশ-বাতাস ভরে উঠেছে মানুষের কান্নায় আর আর্তনাদে। যদিও এই মহাবিপর্যয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার হাত, তবুও নিহত মানুষকে ফিরিয়ে আনা যায় নি জীবনে। প্রাণে বেঁচে-যাওয়া মানুষদের মনে ফিরিয়ে আনা যায় নি আগেকার নিরাপদ জীবনের আশ্বাস। একটি হিসেব থেকে জানা গেছে, মৃতের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা হাজার দুয়েক, আহত ছ'হাজার।



ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত একটি হাসপাতাল।

এই ভূমিকম্পের মাত্র বছর খানেকের মধ্যেই 10 অক্টোবর 1986 তারিখে প্রতিবেশী এল সালভাদোরের রাজধানী ও

পৃথিবী—3

আশেপাশের অঞ্চল আর এক বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কবলে পড়ে। প্রায় 2000 মানুষ প্রাণ হারান। তাছাড়া অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতিও যথেষ্ট। রিকটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা 5·4।

পৃথিবীর বুকে প্রকৃতির এই নির্মম নিষ্ঠুর খেলা আজ নতুন নয়। ভূমিকম্পের এই ধ্বংসলীলায় ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ ধনপ্রাণ হারিয়েছে নির্বিচারে, তবু প্রকৃতির রসনার তৃপ্তি ঘটেনি। প্রতিবছর এভাবে কত মানুষ প্রাণ হারান? একটি হিসেব থেকে দেখা গেছে, প্রতিবছর ভূমিকম্পের কবলে পড়ে প্রাণ হারান প্রায় দশ হাজার মানুষ। পৃথিবীর কয়েকটি বিধ্বংসী ভূমিকম্পে কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছেন তা' বোঝা যাবে নিচের তালিকায় চোখ বোলালে।

দেশ	বছর	মৃত মানুষ
শানসি (চীন)	1556	1,30,000
মেসিনা (ইতালি)	1908	1,00.000
কানসু (চীন)	1920	1,00,002
কানটো (জাপান)	1923	1,00,000
লিসবন (পর্তুগাল)	1755	60,000
কোয়েটা (পাকিস্তান)	1935	30,000
কাংড়া (ভারত)	1905	20,000
মেক্সিকো সিটি (মেক্সিকো)	1985	20,000

ভূকিকম্পের ক্ষয়ক্ষতির কথা তো শোনা হলো। কিন্তু ভূমিকম্প আসলে কী, তা' তো বোঝা গেল না। সহজ কথায়, ভূমিকম্প মানে ভূমির কম্পন। অর্থাৎ ভূমি যখন কাঁপে, তখনই ভূমিকম্পের জন্ম। কিন্তু কেন কাঁপে? সে প্রশ্নে পরে আসছি। ভূমিকম্পের ভূমির অর্থ ভূপৃষ্ঠ। এই ভূপৃষ্ঠের ওপরেই তো মানুষের সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। এই ভূপৃষ্ঠ যখন প্রবলভাবে কাঁপতে শুরু করে, তখন শুধু বাড়িঘর নয়, কোন কিছুই প্রায় অক্ষত থাকে না। তাছাড়া ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে ভূপ্রকৃতির রূপ বদল হয়। শিলাচ্যুতি ঘটে, ভূপৃষ্ঠে বড় বড় ফাটল তৈরি হয়, পাহাড় থেকে ধস নেমে আসে, ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে জলোচ্ছ্বাস হতে পারে, ভূমি থেকে উপড়ে আসে শিকড়শুদ্ধ গাছপালা, নদীতে মাছ মরে যায়, পাখিরা অস্বস্তিতে ভোগে, ভূগর্ভ থেকে নানারকম নির্ঘোষ শোনা

যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কত আর বলা যাবে! এতো গেল ভূমিকম্পের ফলে বাহ্যিক ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে যে অগণিত মানুষ প্রাণ হারায়, তার চেয়ে বেদনাময় ঘটনা আর কী ঘটতে পারে!

বাহ্যিকভাবে সব ভূমিকম্পেই বাড়িঘর ভাঙ্গে, রেললাইন উপড়ে আসে, মানুষজন প্রাণ হারায়। তবু একথা বলতেই হয়, সব ভূমিকম্পের তীব্রতা সমান নয়। সমান বিধ্বংসী নয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা সত্যিই কতখানি, তা পরিমাপের জন্য ভুবিজ্ঞানীরা একটি স্কেল করেছেন সেই 1828 সালেই। কোন জিনিস কতটা লম্বা, কতটা চওড়া তা মাপবার জন্য যেমন চাই স্কেল, ঠিক তেমনি ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপবার জন্যও স্কেল তৈরি করেছেন ভূবিজ্ঞানীরা। একটি নয়, বেশ কয়েকটি স্কেল রয়েছে ভূমিকম্পের তীব্রতা প্রকাশ করবার জন্য। তবে যে স্কেল মোটামুটিভাবে সব ভূবিজ্ঞানীরাই মেনে নিয়েছেন সেটি হলো রিকটার স্কেল (1935)। ক্যালিফোরনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি. এফ রিকটার এই স্কেলটি চালু করেছেন। এই স্কেলটি ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপবার যন্ত্র সিসমোগ্রাফের (seismograph) ওপর নির্ভরশীল। এই স্কেলের সর্বোচ্চ মান দশ। রিকটার স্কেলে ভূপৃষ্ঠের ওপর ধ্বংসলীলার পরিবর্তে ভূমিকম্পের প্রকৃত তীব্রতা বা শক্তির পরিমাপ করা হয়। খুব সাধারণ মৃদু ভূমিকম্পের মাপ এই স্কেলে 1·5 থেকে 2 হতে পারে। আর ভয়ংকর বিধ্বংসী ভূমিকম্পের 8·5 থেকে 9। 1897 সালে আসামে যে বিধ্বংসী ভূমিকম্প হয়েছিল তার মাপ 8·5। আর 1962 সালে ইরানের ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল প্রায় একই রকম। রিকটার স্কেল ছাড়াও ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠে ধ্বংসলীলার ওপর ভিত্তি করে আর একটি আন্তর্জাতিক সর্বজনগ্রাহ্য স্কেলও রয়েছে। এটি হলো সংশোধিত মারসেল্লী স্কেল (1931)। এতে বারোটি ভাগ। যেমন, যে মৃদু কম্পন শুধু সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে তা' হলো এক নম্বর। আর বারো নম্বর বলতে বোঝায় সর্বাত্মক ধ্বংস।



সিসমোগ্রাফে ভূমিকম্পের হিসেব

ভূমিকম্প কেন? এর উত্তর বিশদভাবে আলোচনার আগে এটুকু বলা যেতে পারে, ভূমিকম্পের জন্ম ভূপৃষ্ঠের গভীরে অথবা নিচে পাথরের শরীরে

আলোড়নের ফলে। ভূপৃষ্ঠের উপর যেখানে ভূমিকম্পের জন্ম, তার নাম ভূমিকম্প-কেন্দ্র (focus)। তবে ভূকম্পন কেন্দ্রের গভীরতা কম বা বেশি হতে পারে। সবচেয়ে গভীর ভূকম্পন কেন্দ্রের হদিশ পাওয়া গেছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। এই গভীরতা আনুমানিক 150 মাইল। ভূ-পৃষ্ঠে যে স্থানের নিচে ভূকম্পন কেন্দ্র, তার নাম উপকেন্দ্র (epicentre)। ভূমিকম্পের ফলে পাথরের শরীরে যে কাঁপুনি শুরু হয় তার তীব্রতা মাপা হয় সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে, একথা তো আগেই বলা হয়েছে। বেশ কয়েকটি স্থান থেকে সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়া পাথরের কম্পন বিশ্লেষণ করে কোন ভূমিকম্পের ভূকম্পন-কেন্দ্র নির্ণয় করা যায়।

ভূকম্পন কেন্দ্রের গভীরতা কতখানি? সাধারণভাবে বলতে হয়, অধিকাংশ ভূকম্পন কেন্দ্রের গভীরতা খুবই কম। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 30 মিটারের মধ্যে। মাঝারি গভীরতার ভূকম্পন কেন্দ্র দেখতে পাওয়া যায় 30 থেকে 150 মিটারের মধ্যে। এর চেয়ে বেশি গভীরতার ভূকম্পন-কেন্দ্র প্রকৃতিতে সত্যিই বিরল।

নিচের তালিকায় কতগুলি ভূমিকম্পের সময় ও তীব্রতা (রিকটার স্কেল অনুযায়ী) উল্লেখ করা হলো।

অঞ্চল / দেশ	সময়	তীব্রতা
কানটো, জাপান	1923	7·9
হোলিস্টার, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	1960	5·0
শেকিহারা, জাপান	1944	9·0
নাগায়োকা, জাপান	1961	7·0
নিইগাতা, জাপান	1964	7·5
ডুনাহারাজাতি, হাঙ্গেরি	1956	6·0
তাশখন্দ, সোভিয়েত রাশিয়া	1966	5·5
সানফ্রানসিসকো, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	1971	6·4
আশখাবাদ, সোভিয়েত রাশিয়া	1957	8·0
আফগানিস্তান	1959	5·0
হিন্দুকুশ	1965	7·5
চিলি	1960	8·3
সিটকা, আলাসকা	1972	7·2

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে যে ভূমিকম্প হয়েছে তার একটি তালিকা দেওয়া হলো নিচে। এতে অবশ্য ভারতের হিসেব ধরা হয় নি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	: 1911-12, 1906, 1964, 1979
ইতালি	: 1693, 1783, 1908, 1915
ইরান	: 1775, 1957 (উত্তর ইরান), 1957 (পশ্চিম ইরান), 1968, 1978, 1979 (উত্তর-পূর্ব), 1981 (দক্ষিণ ইরান), 1983
ইকুয়েডর	: 1797, 1868, 1889
কলম্বিয়া	: 1983
গ্রীস	: 1980 (দক্ষিণ গ্রীস), 1984 (করিন্থ)
গ্রেট ব্রিটেন	: 1580, 1602, 1708, 1750, 1916, 1814
গায়না	: 1983
চিলি	: 1906, 1939, 1960, 1965, 1981 (ওকিম্বো)
চীন	: 1057, 1290, 1556, 1920, 1932, 1964, 1975, 1976, 1969
জাপান	: 1293, 1528, 1703, 1923, 1946, 1948, 1978, 1981, 1982 (হক্কাইডো), 1982 (টোকিয়ো)
পর্তুগাল	: 1531, 1755
পাকিস্তান	: 1935 (তৎকালীন ভারত), 1981, 1983 (চারবার)
সোভিয়েত রাশিয়া	: 1948 (6 অক্টোবর), 1980 (23 জানুয়ারি), 1983 (2 এপ্রিল) 1984 (21 মার্চ)

ভারতীয় ভূখণ্ডে স্মরণীয় কালের মধ্যে যেসব ভূমিকম্প হয়েছে, তার মধ্যে 1720 সালে দিল্লী ও 1737 সালে (11ই অক্টোবর) কলকাতার ভূমিকম্পের কথা প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে। সে সময় কলকাতার বেশির ভাগই ছিল মাটির কাঁচা বাড়ি, সেজন্য মানুষজন তেমন মারা পড়ে নি। তবে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্টই হয়েছিল। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি, সে সময় নাকি গঙ্গায় বহু নৌকো, জাহাজ ধ্বংস হয়। মোট দু'হাজার জলযান। তার মধ্যে ইংরেজদের আটখানা জাহাজ ছিল। সেইসব জাহাজে নাকি ছিল প্রচুর সোনাদানা ধনরত্ন।

1819 সালে (16ই জুন) কচ্ছের ভূমিকম্পে প্রায় 2-3 হাজার লোক মারা যায়। ভূমিকম্পের ফলে সিন্ধু নদের একটি শাখায় কৃত্রিম বাঁধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

1897 সালের 12ই জুন প্রচণ্ড ভূকম্পনের সৃষ্টি হলো উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যে। শিলং শহরের (বর্তমান মেঘালয়) চারপাশে প্রায় দেড় লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রবল ভূমিকম্পে অসংখ্য প্রাণহানি ও ধন সম্পত্তির দারুণ ক্ষতি হয়েছিল। রিকটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল 1·5। এই ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়েছে ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় 8 কিলোমিটার নিচে 320 কিলোমিটার লম্বা একটি শিলাচ্যুতিকে (fault)।

1905 সালে হিমাচল প্রদেশের কাংড়া জেলার ভূমিকম্পে প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।

এরপর আসাম নয়, ভূমিকম্পের রোষ পড়ে নেপাল ও বিহারের ওপর। 1934 সালের 15ই জানুয়ারি বেলা প্রায় সওয়া দু'টোর সময় বিহারের উত্তরাংশ ও নেপালের দক্ষিণ ভাগ এক প্রবল ভূকম্পনে কেঁপে উঠল। এই ভূমিকম্পে মতিহারি, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, কাঠমাণ্ডু ও মুঙ্গের জেলার অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বন্যার জল সমস্ত অঞ্চলটিকে প্লাবিত করে ফেলে। কম করেও সেবার প্রায় 12 হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। সংশোধিত মারসেল্লী স্কেল অনুযায়ী এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল **XI** (**11**) নম্বর শ্রেণীর। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পলিমাটির নিচে শক্ত পাথরে বিচ্যুতি ঘটবার ফলেই ভূমিকম্পের উৎপত্তি।

1930 সালে আসামের ধুবড়িতে ভূমিকম্পের পর 1935 সালের 31 মে নিকষ কালো অন্ধকারের বুক চিরে বেলুচিস্তানের কোয়েটা ও কালাট শহর (এখন অবশ্য পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) ভূমিকম্পের প্রচণ্ড দামামায় কেঁপে উঠল। মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল বিশ হাজার।

1937 (দেরাদুন) ও 1938 (সাতপুরা) সালের পর ভূমিকম্পের দামামা আবার বাজল আসামে। স্বাধীনতার তৃতীয় বার্ষিক উৎসব শেষে সন্ধে 7-40 মিনিটে তৎকালীন আসাম রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এক ভীষণ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। এই ভূমিকম্পের তীব্রতা এতই প্রচণ্ড ছিল যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভূমিকম্প মাপক কেন্দ্র থেকে এই ভূকম্পন অনুভব করা গেছে। শুধু অনুভব করা নয়, এই ভয়ংকর ভূমিকম্পকে সবাই নানা বিশেষণে ভূষিত করেছে।

'ভয়ংকর, প্রচণ্ড, অভূতপূর্ব, ভয়াবহ' ইত্যাদি বিশেষণগুলি শুনলে বোঝা যায়, পৃথিবীতে এত প্রচণ্ড ভূমিকম্প এর আগে খুব কমই হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকম্প-বিশারদদের মতে, এটি পৃথিবীর পাঁচটি প্রচণ্ডতম ভূমিকম্পের একটি। রিকটার স্কেল অনুযায়ী এই ভূমিকম্পের তীব্রতা 8·5। পৃথিবীর ভয়ংকরতম অন্য চারটি ভূমিকম্প হলো আসাম (11ই জুন 1897), লিসবন (1লা নভেম্বর, 1755), কানসু (চীন) (16ই ডিসেম্বর, 1920) ও বিহার-নেপালের (15ই জানুয়ারি, 1934) ভূমিকম্প। আসামের এই ভূমিকম্পে প্রায় 15,000 বর্গমাইল এলাকায় প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই এলাকার মধ্যে রয়েছে উত্তর লখিমপুর, ডিব্রুগড়, জোড়হাট, তিনসুকিয়া, সাদিয়া, শিবসাগর ইত্যাদি মহকুমা অঞ্চল ও মিশমি ও আবর পাহাড়ী জায়গা। তখনকার দিনের হিসেবে প্রায় দশ কোটি টাকার ধনসম্পত্তি নষ্ট হলেও ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুযায়ী মানুষ মৃত্যুর সংখ্যা কম। এর কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ তখন সজাগ ছিল। ফলে নিরাপদ জায়গায় পালাতে তেমন অসুবিধে হয় নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি ভূপৃষ্ঠের গভীরে শিলাচ্যুতির ফলে। ভূকম্পন-কেন্দ্রের সম্ভাব্য গভীরতা প্রায় 14 কিলোমিটার।

1967 সালের (11ই ডিসেম্বর) এক ভূমিকম্পে তছনচ হয়ে যায় পশ্চিম মহারাষ্ট্রের এক বিস্তৃত অঞ্চল। কয়নানগর প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আশেপাশের সাতারা, সাংগলি, কোলাপুর ও রত্নগিরি জেলায় কম করেও এক হাজার গ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের এই তাণ্ডব শুধু মহারাষ্ট্রের ওপরই আঘাত হানে নি। ফাটল ধরিয়েছে ভূবিজ্ঞানীদের চিরকালের বিশ্বাসের ভিতে। প্রমাণ করেছে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলকে যতখানি অনড় মনে করা হতো, ততখানি অনড় সে নয়। কয়না ভূমিকম্পের তীব্রতার পরিমাপ ও কেন্দ্রের গভীরতা নিয়ে ভূবিজ্ঞানীদের বেশ মতভেদ রয়েছে। সাধারণ ভাবে তীব্রতার পরিমাণ রিকটার স্কেল অনুযায়ী 6·5 থেকে 7·5 এবং ভূকম্পন কেন্দ্রের গভীরতা 16 থেকে 30 কিলোমিটার পর্যন্ত।

ভারতীয় ভূখণ্ডের ভেতরে পরবর্তী সময়ে যে সব ভূমিকম্প হয়েছে, তার মধ্যে যা মোটামুটি ভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হলো : 1975 (19 জানুয়ারি, হিমাচল প্রদেশ), 1979 (5 আগস্ট, ওড়িশা), 1979 (22 ডিসেম্বর, শিলং), 1980 (6 ফেব্রুয়ারি, কয়না), 1983 (30 ডিসেম্বর, গৌহাটি), 1983 (30 জুন, হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ), 1983 (30 আগস্ট, শিলচর, গৌহাটি),

1983 (30 ডিসেম্বর, গৌহাটি, শিলং), 1983 (31 ডিসেম্বর, উত্তর-পশ্চিম ভারত), 1983 (25 জানুয়ারি, আন্দামান), 1984 (31 ডিসেম্বর, কাছাড়), 1986 (এপ্রিল, হিমাচল প্রদেশ), 1987 (18 মে, শিলচর, শিলং)।

'ভূমিকম্প কেন ?' এই প্রশ্নটি বিচার-বিবেচনা করে ভূবিজ্ঞানীরা তিনটি প্রধান কারণের কথা বলেছেন। এক, ভূপৃষ্ঠ-জনিত, দুই, আগ্নেয়গিরি-জনিত এবং তিন, শিলাচ্যুতি-জনিত।

এক ঃ ভূপৃষ্ঠ-জনিত কারণ ঃ পাহাড়ী অঞ্চলে ধস নামবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, 1811 সালে তুর্কিস্তানের ভূমিকম্পে পামীর উপত্যকা অঞ্চলে 50,000 কোটি টন ওজনের বিশাল ধস (landslide) পর্বতশীর্ষ থেকে নেমে এসেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বিরাট ধস নামবার ফলেই এই ভূমিকম্প। প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী আর ডি ওল্ডহ্যাম তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূকম্পনের ফলেই পাহাড়ী জায়গায় সর্বনাশা দূতের মতো বিরাটাকার ধস নামতে শুরু করে। কিন্তু ধস আগে না ভূমিকম্প আগে ? এই প্রশ্নের সদুত্তর 'ডিম আগে না মুরগী আগে'র মতোই পাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মহাদেশের উপকূলভাগে সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, তা' ক্ষীণ হলেও কলকাতায় আলিপুরের আবহাওয়া অফিসের যন্ত্রে প্রায়ই ধরা পড়ে।

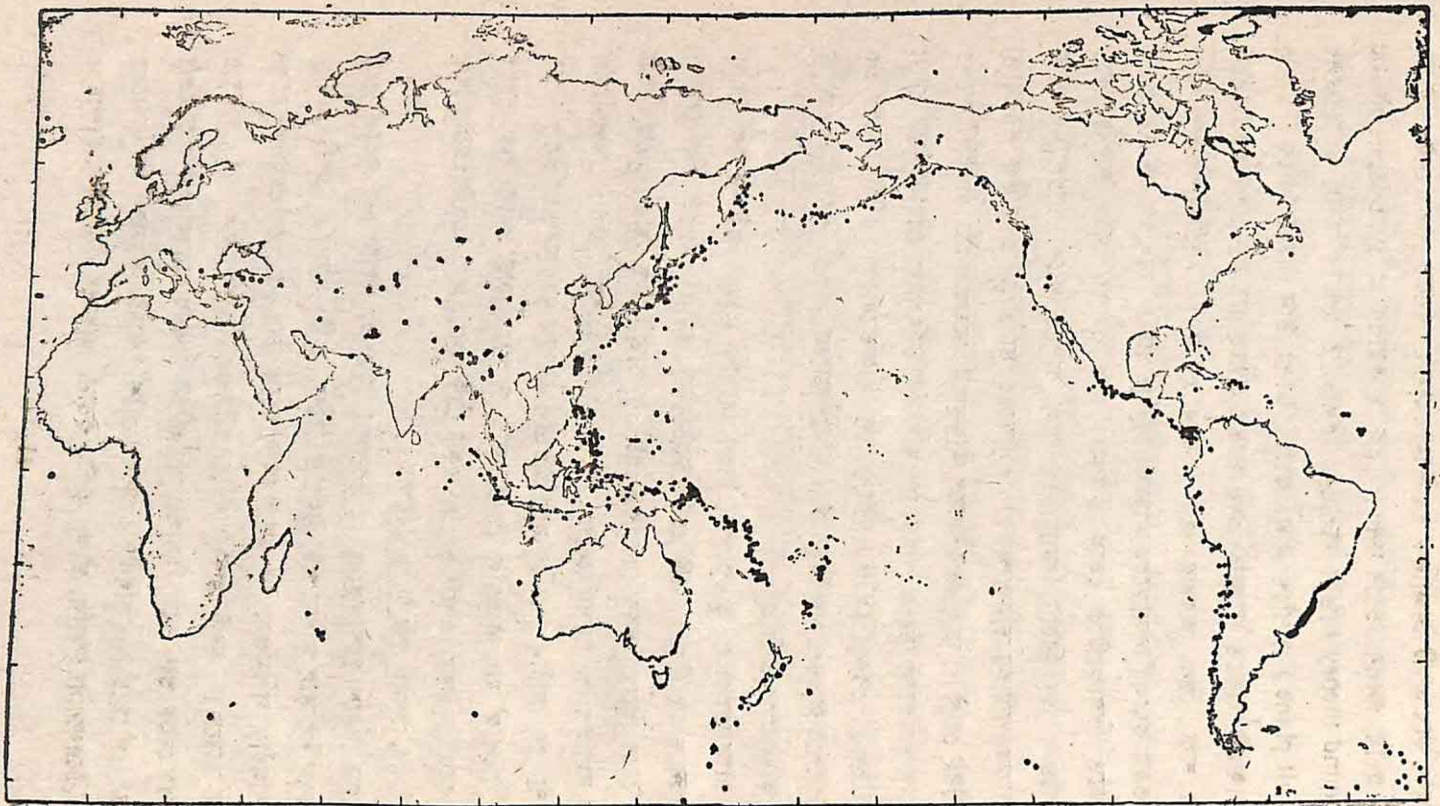
দুই ঃ আগ্নেয়গিরি-জনিত কারণ ঃ বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে জানা যায়, কখনো কখনো বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসবার জন্য প্রচণ্ড শক্তিতে যখন আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে শিলাস্তরে আঘাত করতে থাকে, তখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। 1882 সালে জাভার ক্রাকাতোয়ায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল। ঐ বছরেই জাপানের বন্দইসানে আগ্নেয়গিরি থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পও শুরু হয়েছিল।

তিন ঃ শিলাচ্যুতি-জনিত কারণ ঃ আধুনিক ভূবিজ্ঞানীদের মতে, ভূগর্ভের অভ্যন্তরে শিলাচ্যুতিকেই মূল কারণ বলে মনে করা হয়। 1906 সালের সানফ্রানসিসকো ভূমিকম্প ও সান অ্যানড্রিয়াস শিলাচ্যুতির কার্যকারণ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে অধ্যাপক এইচ এফ রিড ভূমিকম্পের কারণ

বিশ্লেষণ করে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপহার দেন। বলতে দ্বিধা নেই, এই তত্ত্ব তাঁর সুদীর্ঘ অনলস চিন্তার ফসল। এই স্থিতিস্থাপক প্রতিঘাত তত্ত্বে (elastic rebound theory) তিনি বলেছেন, শিলাচ্যুতি হওয়ার আগে চ্যুতি-তলের (fault plane) দু'পাশে নানা কারণে ক্রমশঃ টান পড়তে থাকে। ফলে শিলাস্তরটি বাঁকতে বাঁকতে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যখন শিলাস্তরটির পক্ষে আর শক্ত স্থির অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না। স্থিতিস্থাপকতার সীমা অতিক্রম করলেই শিলাস্তরের আচমকা বিচ্যুতি ঘটে। মনে হয়, কে যেন প্রচণ্ড শক্তিতে শিলাস্তরটিকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে পরস্পর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এই বিরাট শিলাচ্যুতির ফলে কাঁপতে থাকে পারিপার্শ্বিক সমস্ত শিলাস্তর, সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের। শিলাস্তরের চ্যুতিবিচ্যুতি ভঙ্গিল পর্বতমালা অঞ্চলেই বেশি। তাই এসব অঞ্চলে আকছারই ভূমিকম্প হয়। 1897 সালের আসাম ভূমিকম্পে চিদরং শিলাচ্যুতির ফলে একটি শিলাস্তর প্রায় 35 ফিট নেমে গিয়েছিল। পেরু (1970) কিংবা এল সালভাদোরের (1986) সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের কারণও অন্য কিছু নয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শিলাচ্যুতির ফলেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি।

সাম্প্রতিককালে ভূমিকম্পের কারণ হিসেবে নতুন একটি তত্ত্বকে মেনে নিচ্ছেন ভূবিজ্ঞানীরা। এটি 'প্লেট টেকটনিকস্ তত্ত্ব'। আগেই বলা হয়েছে, এই তত্ত্বের হিসেবে ভূত্বক বেশ কিছু প্লেট (বা পাত) দিয়ে তৈরি। এক একটি প্লেট মহাদেশ ও সমুদ্রতলদেশের অংশ মিলিয়ে মিশিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বহু প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক যুগে প্লেটগুলি একসঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ছিল। পরে এগুলি ভেঙ্গে যায় কতগুলি প্লেটে, আর পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরতে শুরু করে। এভাবে চলতে চলতে একটি প্লেট যখন আর একটি প্লেটের সঙ্গে ধাক্কা খায়, তখনই সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের।

গত দেড়শো-দুশো বছরের ভূমিকম্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বেশির ভাগ ভূমিকম্পের উৎপত্তি বিশেষ দু'টি অঞ্চলে। একটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিমণ্ডল, যা প্রশান্ত মহাসাগরকে চারদিক থেকে মেখলার মতো ঘিরে রয়েছে। অন্যটি ভূমধ্যসাগরীয় পরিমণ্ডল, যার পরিধি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে হিমালয় ও এশিয়া মাইনর হয়ে আলপস পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছেছে। পৃথিবীর যেসব দেশে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইতালি, গ্রীক, তুর্কী, ইরান, ভারতের উত্তরাঞ্চল, ইন্দোচীন



ফুটকি দেওয়া জায়গাগুলি ভূমিকম্প-প্রবণ

অঞ্চল, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম পার্বত্য অঞ্চল ও মধ্য আমেরিকা। ভূমিকম্পের প্রবণতা হিসেবে ভারতকেও পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

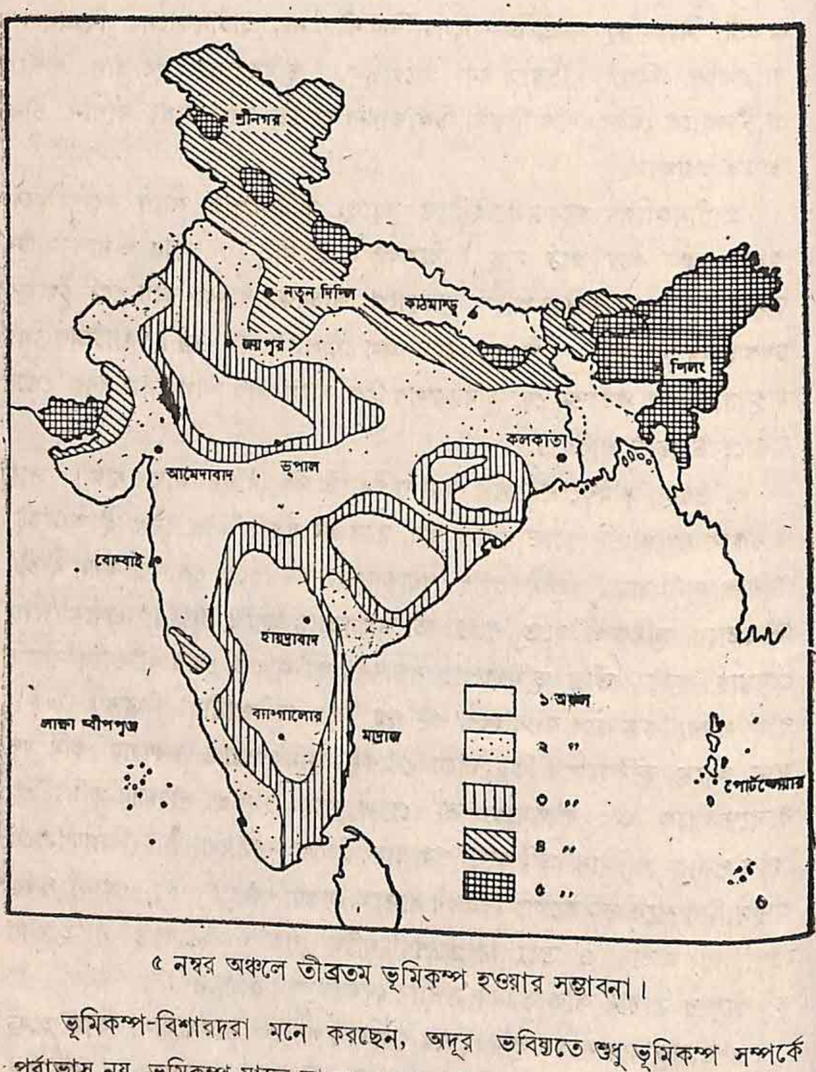
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব কি? এ প্রশ্ন নিয়ে শুধু সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানীরা নয়, প্রাচীনকালের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরাও বিস্তর চিন্তাভাবনা করেছেন। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্পর্কে প্রাচীনকালে যেসব দেশে কিছুটা চিন্তাভাবনা হয়েছে, তার মধ্যে জাপান, চীন, ভারত অগ্রগণ্য।

প্রাচীনকালের অনেক কাহিনীতে আছে, ভূমিকম্পের আগে জলের মধ্যে অসম্ভব চঞ্চল হয়ে ওঠে মাছ (বিশেষত মাগুর মাছ)। ব্যাঙ ও সাপ মাটির তলার গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে, আকাশে আচমকা রামধনু ফুটে ওঠে, চুম্বকের চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যায়। কিংবা কুঁয়োর জল ঘোলাটে হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালের মানুষরা বিশ্বাস করতেন যে, ভূমিকম্পের ঠিক আগে তার আগমনের খবর পেয়ে যায় ছোট ছোট প্রাণীরা।

প্রতিবছর ভূমিকম্পের ফলে সারা পৃথিবীতে বহু মানুষ মারা যায়। তাই ভূমিকম্প সম্বন্ধে যদি পূর্বাভাস করা যায়, তবে এই মৃত্যুর হার নিশ্চয়ই অনেকটা কমিয়ে আনা যায়। ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের অর্থ হলো কোথায় কখন কতটা তীব্রভাবে ভূমিকম্প হতে পারে, তা আগেভাগে বলতে পারা। এখনো পর্যন্ত কোথায় কতটা তীব্র ভূমিকম্পের সম্ভাবনা, তা' হয়তো মোটামুটিভাবে বলতে পারা সম্ভব, কিন্তু কবে কখন হবে, এই প্রশ্ন নিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা বিব্রত। একথা জানা আছে, ভূমিকম্পের কিছু আগে থেকেই ভূমিকম্পগ্রস্ত অঞ্চলের ভূমি মৃদু কাঁপতে থাকে এবং মাঝেমধ্যে তা' হেলে পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে ভূমির এই হেলে পড়ার পরিমাণ ভূমিকম্প পূর্বাভাস কেন্দ্রে পাঠালে তা' বিশ্লেষণ করে আনুমানিকভাবে ভূমিকম্পের দিনক্ষণ বাতলে দেওয়া সম্ভব। তবু এখনো পর্যন্ত যন্ত্রপাতির অভাব ও তথ্য বিশ্লেষণের সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হওয়ায় ভূমিকম্পের আগাম আভাস নির্ভুলভাবে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এসব অসুবিধে সত্ত্বেও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানে। বেশকিছু ভূমিকম্পের ওপর বহু সমীক্ষা চালিয়ে সোভিয়েত ভূবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন, ভূমিকম্পের আগে ভূগর্ভে ভূকম্পনতরঙ্গের গতিবেগের একটি বিশেষ অনুপাত

প্রচণ্ডভাবে কমে যায়। তাছাড়া ভূমিকম্পের কিছু আগে ভূগর্ভস্থ জলের রাসায়নিক চরিত্র অনেকটাই বদলে যায়। এ জাতীয় নানা পন্থা ও পদ্ধতির সাহায্যে রাশিয়ান ভূবিজ্ঞানীরা 1966 সালের (26 এপ্রিল) তাশখন্দ ভূমিকম্প সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস করতে পেরেছিলেন।



৫ নম্বর অঞ্চলে তীব্রতম ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা।

ভূমিকম্প-বিশারদরা মনে করছেন, অদূর ভবিষ্যতে শুধু ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্বাভাস নয়, ভূমিকম্প যাতে না হয় অথবা তীব্রতা হ্রাস পায়, এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থাও নেওয়া সম্ভব হবে।

সাত ঃ আগ্নেয়গিরি

সাধারণভাবে আগ্নেয়গিরি বলতে বুঝি, শক্ত লাভায় তৈরি এমন এক পর্বত, যার গহ্বর থেকে আচমকা বেরিয়ে আসে গলিত লাভার স্রোত অথবা বিষাক্ত কালো গ্যাসের কুণ্ডলী। ভেতরের দারুণ চাপে গলিত লাভা অথবা গ্যাস বেরিয়ে আসবার সময় ভেতরের দেওয়ালে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। ফলে অনেক সময়েই শক্ত লাভায় তৈরি আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরোনোর পথটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দূরে দূরান্তরে। এইসব জমাটবাঁধা শক্ত লাভার নাম পাইরোক্লাস্ট (pyroclast)। যে লাভা খুব তরল নয়, অনেকটা আলকাতরার মতো আঁঠালো ও চটচটে (viscous), সেই লাভা থেকে পাইরোক্লাস্ট খুব সহজেই গঠিত হতে পারে। সাধারণত প্রায় সমস্ত আগ্নেয়গিরি থেকেই প্রথম অবস্থায় গলিত তরল লাভার স্রোতের বদলে জমাট বাঁধা লাভার টুকরো সবচেয়ে বেশি বেরিয়ে আসে।

অগ্ন্যুৎপাতের দ্বিতীয় পর্যায়ে তরল লাভা প্রধান গহ্বরের পথ বেয়ে জ্বালামুখের (crater) মাথায় চলে আসে। তারপর বাইরে বেরিয়ে পাহাড়ের শরীর বেয়ে নিচে নামতে থাকে। সেই প্রলয়ংকর গলিত লাভার স্রোতের নিচে চাপা পড়ে যায় পাহাড়, বন, নদী, নালা, শহর, গ্রাম—সবকিছু। যে লাভা বেশি তরলায়িত অবস্থায় থাকে, সেই লাভার পক্ষেই বিরাট বিস্তীর্ণ এলাকা লাভার সমুদ্রে ঢেকে দেওয়া সম্ভব। অন্যদিকে যে লাভা আলকাতরার মতো আঁঠালো, সেই লাভার পক্ষে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে খুব বেশি দূরে গড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তার আগেই এই লাভা জমাট বেঁধে শক্ত নিরেট পাথর হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বলি, যদি লাভার মধ্যে সিলিকন ডাই-অক্সাইডের

পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকে, তবে লাভার স্রোত ভয়ঙ্কর আগুনের ঝরণার রূপ নিয়ে আগ্নেয়গিরির ঢাল বেয়ে নেমে আসে নিচের দিকে।



আগ্নেয়গিরি থেকে নিক্ষিপ্ত লাভার খন্ড

আগ্নেয়গিরি থেকে সাধারণত দু'ভাবে লাভা নিঃসৃত হয়। প্রথমত, একটি কেন্দ্রীয় নল বা পাইপ জাতীয় নির্গমন পথ দিয়ে লাভার স্রোত বেরিয়ে আসতে পারে (কেন্দ্রীয় অগ্নুৎপাত বা pipe eruption)। দ্বিতীয়ত, ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত লম্বা ফাটলের মুখ দিয়ে নির্গত হতে পারে গলিত স্রোত (ফাটলবাহী অগ্ন্যুৎপাত বা fissure eruption)।

অগ্ন্যুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরির জালামুখ থেকে যে বিশাল আয়তনের গ্যাস বেরিয়ে আসে, তার মধ্যে শতকরা প্রায় 80—90 ভাগই জলীয় বাষ্প। অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে থাকে কারবন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন, গন্ধক, ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, সোডিয়াম ক্লোরাইড, কারবন মনোক্সাইড, হাইড্রোকারবন গ্যাস, বোরিক অ্যাসিড, বোরন, ফসফরাস, আরসেনিক গ্যাস ইত্যাদি। সম্প্রতি (24 আগস্ট 1986) আফরিকার ক্যামেরুনের নিয়োস আগ্নেয়হ্রদ থেকে বেরিয়ে আসা বিষবাষ্পে প্রায় 2000 মানুষ প্রাণ হারান। জানা গেছে, প্রচণ্ড বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসই এই বিপর্যয়ের কারণ। অক্সিজেন গ্যাস ছাড়া

মানুষ যেমন বাঁচতেই পারে না, হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসও মানুষের প্রাণ নিতে তেমনই ওস্তাদ।

অগ্ন্যুৎপাতের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী আগ্নেয়গিরিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেসব আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায়ই অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ঘটে, তাকে বলা হয় সজীব বা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি (active volcano)। আর যে আগ্নেয়গিরি থেকে ক্বচিৎ কদাচ বিস্ফোরণ ঘটে, তার নাম ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি (dormant volcano)। এছাড়া যেসব আগ্নেয়গিরি থেকে সুদূর অতীতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল, কিন্তু সাম্প্রতিককালের মধ্যে আর লাভা বা গ্যাস নিঃসৃত হবার কোন সম্ভাবনা নেই, তা মৃত অগ্নেয়গিরি (extinct volcano)। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির উদাহরণ হিসেবে ইতালির মাউন্ট এটনা, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কিলাউরিয় আগ্নেয়গিরির নাম উল্লেখ করা যায়। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি বলতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের ব্যারেন দ্বীপ ও নারকোনডাম (নরক-কুণ্ডম) দ্বীপের নাম মনে পড়বেই। ব্যারেন দ্বীপের আগ্নেয়গিরি থেকে 1795 ও 1803 সালে অগ্ন্যুৎপাতের বিবরণ পাওয়া গেছে। নারকোনডাম দ্বীপের আগ্নেয়গিরি সজীব ছিল প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে প্লায়াস্টোসিন (Pleistocene) যুগে। তার পর আর এর ঘুম ভাঙ্গে নি।

দীর্ঘ 400 বছর ঘুমিয়ে থাকবার পরে গত 1985 সালের 13ই নভেম্বর মধ্য কলম্বিয়ার নেভাদো দেল রুইজ আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জেগে ওঠে। এই আগ্নেয়গিরির বিধ্বংসী অগ্ন্যুৎপাতে প্রায় 10 হাজার মানুষ প্রাণ হারান। 5 কিলোমিটার দূরের আরমারো শহরটির প্রায় 90 ভাগ অংশই ধ্বংস হয়।

এছাড়া অগ্ন্যুৎপাতের প্রকৃতি ও ধ্বংসের পরিমাণ অনুযায়ীও সজীব বা জীবন্ত আগ্নেয়গিরিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে

এক ঃ আগ্নেয় পাইপ জাতীয় (Volcanic pipe) ঃ সবচেয়ে শান্ত প্রকৃতির আগ্নেয়গিরি। কেবল গ্যাস বেরোয়, লাভাটাভা ক্বচিৎ কখনো বেরোতে পারে। এ ধরনের আগ্নেয়গিরির দেখা মেলে জারমানির রাইন উপত্যকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়।

দুই ঃ হাওয়াই জাতীয় (Hawaian type) ঃ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এই জাতীয় আগ্নেয়গিরির দেখা মেলে। এই ধরনের আগ্নেয়গিরিতে থাকে লম্বা ফাটল (যা লম্বায় কয়েক মাইল হতে পারে)। এমন ফাটল দিয়ে প্রচুর পরিমাণে তরল লাভা বেরিয়ে আসে। তবে লাভার প্রকৃতি ও গতি শান্ত।

তিন : স্ট্রমবলি জাতীয় (Strombolian type) **:** সিসিলির উত্তরে লিপারি দ্বীপপুঞ্জের স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির নামে এর নামকরণ। এই জাতীয় আগ্নেয়গিরি থেকে মাঝে মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে। লাভার প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত কম তরল হওয়ায় অগ্ন্যুৎপাতের সময় লাভার জমাট খণ্ড প্রায়ই উৎক্ষিপ্ত হয়। এছাড়া আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে দেওয়ালীর আলো বলে ভুল হতে পারে।

চার : ভালকানো জাতীয় (Vulcanian type) **:** এয়োলিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ভালকানো আগ্নেয়গিরির নামে এর নামকরণ। এই জাতীয় লাভা অত্যন্ত চটচটে আঁঠালো, খুব সহজেই জমাট বেঁধে শক্ত নিরেট হয়ে যায়। ফলে এই ধরনের আগ্নেয়গিরি থেকে অসংখ্য শক্ত পাথরের চাঁই উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। তাছাড়া লাভার সঙ্গে সঙ্গে কালবৈশাখীর কালো মেঘের মতো প্রচুর গ্যাসও বেরিয়ে আসে। অবশ্য এই গ্যাস থেকে স্ট্রমবলি আগ্নেয়গিরির মতো আগুন ধরে যায় না।

পাঁচ : ভিসুভিয়ান জাতীয় (Vesuvian type) **:** এই জাতীয় আগ্নেয়গিরির উদাহরণ সিসিলির এটনা (3300 মিটার উঁচু), নেপলস শহরের অদূরে ভিসুভিয়াস (1186 মিটার উঁচু) ও রাশিয়ার কামচাটকা অঞ্চলের কয়েকটি আগ্নেয়গিরি। এই জাতের আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসে প্রচুর লাভা, গ্যাস, ছাই, পাথরের টুকরো। অগ্ন্যুৎপাতের সময় জ্বালামুখের ভেতরেই শক্ত নিরেট লাভার স্তর গড়ে ওঠে। তার ঠিক নিচেই জমতে থাকে প্রচুর গ্যাস যা বেরিয়ে আসবার জন্য পথ খুঁজতে থাকে। এই জমে থাকা গ্যাসের প্রচণ্ড চাপে শক্ত লাভার ঢাকনা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। শুরু হয় অগ্ন্যুৎপাত। অগ্ন্যুৎপাতের প্রথম পর্যায়ে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস, জলীয় বাষ্প ও ছাই বেরিয়ে এসে আকাশের কয়েক কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে। ক্রমে গ্যাস বাষ্প ও ছাইয়ের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় পাথরের উৎক্ষেপণ। পাথর-বৃষ্টি কমে এলে আরম্ভ হয় গলন্ত লাভার উদ্গীরণ। এভাবেই সেই 79 খ্রীস্টাব্দে ভিসুভিয়াসের ছাই (ash) আর লাভার তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল অতীতের রোম সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ নগরী পমপেই ও হারকুলেনিয়াম।

ছয় : বন্দইসান জাতীয় (Bandaisan type) **:** এর নামকরণ জাপানের সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি থেকে। এ ধরনের আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরোয় না, বেরোয় ছোট বড় পাথরের চাই।

(7) **পিলি জাতীয়** (**Pelean type**) ঃ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মারটিনিকে দ্বীপের মাউন্ট পিলি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বোধহয় সবচেয়ে মেজাজী ও বিধ্বংসী। এ ধরনের আগ্নেয়গিরি থেকে বেরোয় গলিত লাভা, শক্ত নিরেট লোহার চাঁই ও প্রচুর ঘন কালো গ্যাস। 1902 সালের 2 মে মাউন্ট পিলির প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংস হয়েছিল মারটিনিকের সমৃদ্ধ নগরী সাঁ্যা পিয়ের। এই শহরের 30 হাজার মানুষের অধিকাংশই প্রাণ হারান এই অগ্ন্যুৎপাতে। যে ছাই ও গ্যাস মাউন্ট পিলি থেকে বেরিয়ে এসেছিল তার উত্তাপ 800 ডিগ্রী সেলসিয়াস ও গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ড 150 মিটার। কী ভয়ংকর নয় কি!

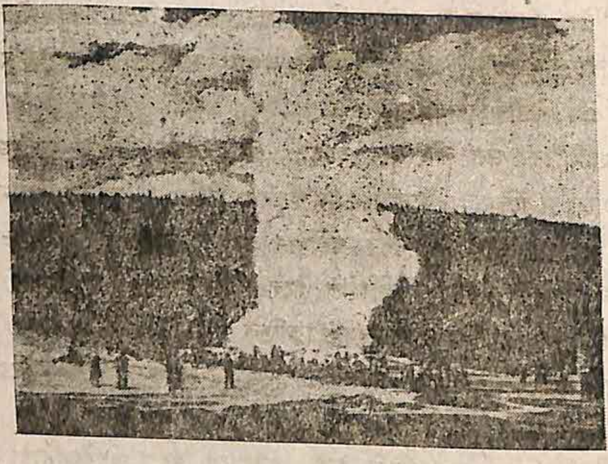
(8) **আইসল্যাণ্ড জাতীয়** (**Icelandic type**) : কেবলমাত্র হাওয়াই জাতীয় ছাড়া আলোচিত আগ্নেয়গিরিগুলির অগ্ন্যুৎপাত হয় একটি কেন্দ্রীয় ছিদ্রপথে বা পাইপের ভেতর দিয়ে। কিন্তু আইসল্যাণ্ড দ্বীপে অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বিস্তৃত ফাটলের মুখ দিয়ে লাভার উদ্গিরণে। দক্ষিণ ভারতের ডেকান ট্র্যাপের (**Decan trap**) অগ্ন্যুৎপাত এভাবেই ঘটেছিল ভূ-পৃষ্ঠের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে।

আগ্নেয়গিরির জন্ম কী করে হলো, এই প্রশ্নের উত্তরে ভূ-বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে বলেছেন, ভূত্বকে কোন কারণে চ্যুতি বা অনুরূপ কোন কিছু ঘটলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে চাপের পরিমাণ হঠাৎ কমে যায়। ফলে ভূ-ত্বকের নিচে কম চাপের অঞ্চলে শিলারাশি গলে গিয়ে ম্যাগমা (magma) তৈরি হয়। এই ম্যাগমা থেকেই নানারকম প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় লাভা ও অন্যান্য গ্যাস তৈরি হয়ে ভূত্বকের অসংখ্য ফাটল বা ছিদ্রপথ দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে উঠে আসে। তৈরি হয় আগ্নেয়গিরি।

সাম্প্রতিক কালে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টির ব্যাপারে অবশ্য ভূ-বিজ্ঞানীরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন প্লেট টেকটনিকস্ তত্ত্বটিকে। এই মত অনুযায়ী পৃথিবীর ত্বক বা ভূত্বক তৈরি বারোটি পাত (plate) দিয়ে। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে ভূ-বিজ্ঞানীরা বলছেন, দু'টি পাত যেখানে ধাক্কা খাচ্ছে, সেখানেই সংঘর্ষের ফলে শিলাস্তর গলে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে আগ্নেয়গিরির। উদাহরণ হিসেবে ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আফ্রিকান প্লেট ও ইউরোপীয়ান প্লেট দুটি যেখানে পাশাপাশি রয়েছে, সেখানে সংঘর্ষ হলেই আগ্নেয়গিরির দাপট বাড়ে। তখন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আগ্নেয়গিরি এটনা, ভিসুভিয়াস, ট্রমবলি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

আবার পাশাপাশি দু'টি প্লেট পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও ভূত্বকের নিচ থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসতে পারে।

বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী বুলার্ডের মতে, সারা পৃথিবীতে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির সংখ্যা 635। তবে এই সজীব আগ্নেয়গিরিগুলির 80টি আবার সমুদ্রের জলের তলায়। এছাড়া ঘুমন্ত ও মৃত আগ্নেয়গিরির সংখ্যাও প্রায় কয়েক হাজারের কাছাকাছি। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির জন্মই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া আজ সম্ভব নয়। তবে আধুনিক কালের মধ্যে মেক্সিকোর জোরুল্লো আগ্নেয়গিরি ও এল সালভাদোরের ইজালকোর জন্ম হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে। ইতালির 3000 মিটার উঁচু এটনা আগ্নেয়গিরি থেকেও দু'বার অগ্ন্যুৎপাতের খবর পাওয়া গেছে 1928 ও 1975 সালে। সাধারণভাবে



আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইয়লোস্টোন পার্কের উষ্ণ প্রস্রবণ।

বলা যায়, অধিকাংশ আগ্নেয়গিরিই ভঙ্গিল পর্বতমালা অথবা মহাদেশের তটকূলের কাছাকাছি অঞ্চলে কয়েকটি সমান্তরাল শ্রেণীতে রয়েছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি সজীব আগ্নেয়গিরির ভিড়। এই আগ্নেয়গিরির দলটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল হয়ে এশিয়ার পূর্ব উপকূল ধরে মেখলার মতো পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত। এই বলয়ে এত বেশি সজীব আগ্নেয়গিরি রয়েছে যে, এর আরেক নাম অগ্নি বলয়

(ring of fire)। আরেকটি পূর্ব-পশ্চিমমুখী বলয়, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত।

আগ্নেয়গিরি কেবলমাত্র অভিশাপই বয়ে আনে না। আগ্নেয়গিরিজাত উত্তাপ মানুষের বহু কাজেই লাগে। যেমন, উষ্ণ প্রস্রবণ। অধিকাংশ উষ্ণ প্রস্রবণের মূলে রয়েছে আগ্নেয়গিরিজনিত উত্তাপ। পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর, বিহারের রাজগীর, জম্মু-কাশ্মীরের পুগা উপত্যকায় ও হিমাচল প্রদেশের মণিকরণ ছাড়া আরও অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে ভারতে। এ ধরনের উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে ভূতাপজনিত শক্তি আহরণ করা হয় ইতালি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি দেশে। ভারতেও ভূ-তাপ আহরণের জন্য বিশেষ চেষ্টা চলছে। দু'একটি জায়গায় ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে।

আট ঃ হিমবাহ

সাধারণত উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে অথবা উঁচু অক্ষাংশের জায়গাগুলোতে বরফের দেখা মেলে। যে উচ্চতা-রেখার ওপরে তুষারের রাজ্য সারা বছরই রয়েছে, তারই নাম হিমরেখা (snow line)। হিমরেখার নিচে বরফের অস্তিত্ব থাকে না। বরফ গলে সৃষ্টি হয় নির্ঝরণী। হিমালয় পাহাড়ে হিমরেখার উচ্চতা 13,000 ফুট থেকে 18,000 ফুট পর্যন্ত দেখা যায়। তবে গরমের সময় তাপমাত্রা বেড়ে গেলে হিমরেখার উচ্চতাও বাড়তে থাকে।

প্রথম অবস্থায় তুষার থাকে ঝুরঝুরে পেঁজা তুলোর মতো। আরো তুষারপাতের সঙ্গে সঙ্গে তুষার-কণা ওপরের তুষারের চাপে ক্রমশই জমাট বেঁধে মোটামুটি শক্ত বরফ জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই জাতীয় পদার্থের বৈজ্ঞানিক নাম নেঁভে (neve)। স্বভাবে বরফ ও তুষারের মাঝামাঝি।



ইয়েন্টনা গ্লেসিয়ার, আলাস্কা

প্রকৃতির রাজ্যে একই সঙ্গে চলেছে ভাঙ্গাগড়ার পালা। তাই পাহাড়ের ঢালে জমে থাকা পুরু বরফের আস্তরণও চলতে শুরু করে মাধ্যাকর্ষণের টানে। এই চলমান বরফের

চাঁইকে বলা হয় হিমবাহ (glacier) অর্থাৎ বহমান বরফ। উপত্যকার আঁকাবাঁকা সর্পিল পথেই হিমবাহ চলনশীল। হিমালয় অঞ্চলে হিমবাহের গতি দিনপ্রতি এক ইঞ্চি থেকে তিন ফুট পর্যন্ত হতে পারে। আগেই বলেছি, হিমরেখার নিচে কখনো হিমবাহের অস্তিত্ব থাকে না, গলে জল হয়, সৃষ্টি হয় নির্ঝরিণীর।

আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থান অনুসারে হিমবাহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গ্রীনল্যাণ্ড বা অ্যাণ্টার্কটিকায় ঘন পুরু বরফের আস্তরণে পাহাড়-পর্বত প্রায় সারা বছরই ঢাকা থাকে। এই জাতীয় পুরু বরফের চাদর আইসল্যাণ্ডেও প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রে এই বরফের চাদর ভেঙ্গে পড়লে তখন তার নাম হিমশৈল (iceberg)। আর এক ধরনের হিমবাহের দেখা মেলে উপত্যকার সর্পিল আঁকাবাঁকা পথে। উপত্যকার দু'পাশের পাহাড়ের দেওয়ালের মধ্যেই তা আবদ্ধ থাকে। এর নাম উপত্যকাবাহী হিমবাহ। হিমবাহের বেশির ভাগ হিমবাহই এই জাতের। হিমালয় অঞ্চলের মধ্যে গঙ্গোত্রী (26 কিলোমিটার), কেদারনাথ (14 কিলোমিটার), কুমায়ুন ও জেমুর (26 কিলোমিটার) হিমবাহগুলি উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘতর হিমবাহের দেখা মেলে আরও উত্তরে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীতে যেখানকার বায়াফো (59 কিলো-মিটার) ও শিয়াচান (72 কিলোমিটার), বলিচোরা (58 কিমি) ও হিসপার (61 কিমি) হিমবাহের নাম উল্লেখ না করলে হিমবাহের তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 128 কিমি লম্বা পৃথিবীর দীর্ঘতম হুবার্ড হিমবাহের সন্ধান পাওয়া গেছে আলাসকায়।

একথা তো তোমরা সকলেই জানো, জল জমে বরফ হলে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। তাই পাহাড়ের ফাটলে জমে থাকা জল বরফ হলে, তার চাপে বরফের ফাটল আরও বেড়ে যায়। তারপর হঠাৎ একদিন সশব্দে পাথরের চাঁই হুড়মুড় করে ভেঙ্গে গড়িয়ে পড়ে। এমনিভাবেই সৃষ্টি হয় হিমানী সম্প্রপাতের। বিশাল পাথরের চাঁই বরফের সঙ্গে মিশে উদ্দাম গতিতে ছুটে আসে ঢালের দিকে। ধ্বংস করে পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা কত গ্রাম জনপদ।

একথা শুনলে তোমরা হয়তো চমকে উঠবে, প্রাগৈতিহাসিক সময়ে, আজ থেকে প্রায় 30 কোটি বছর আগে, গণ্ডোয়ানা যুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের বেশ কিছু জায়গা, যেমন—ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও পাঞ্জাবের বহু অঞ্চল হিমবাহের আস্তরণে ঢাকা ছিল বলে অনেকে মনে করেন। অবশ্য এই বরফের রাজ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। পৃথিবীতে আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বরফের দেশও হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

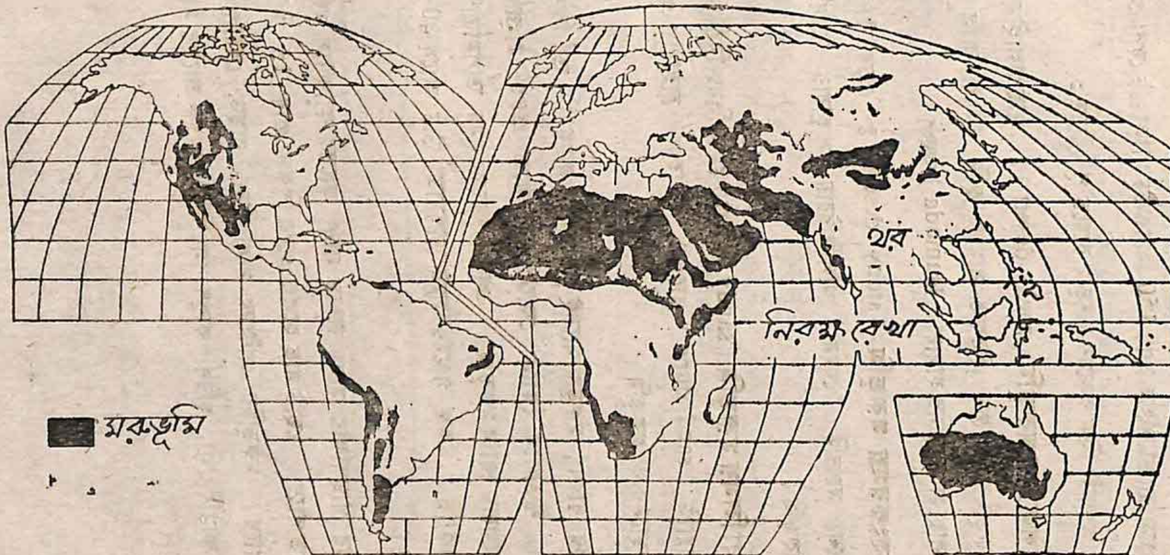
নয়ঃ মরুভূমি

মরুভূমির নাম শুনলেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন শুকিয়ে আসে। তাই না! মনে হয়, মরুভূমি মানে শুধু বালি আর বালি, বালির ঝড়, আরব বেদুইন। হ্যাঁ, আর মনে পড়ে মরুভূমির একমাত্র বাহন উটের কথা, এদিক ওদিক ছড়ানো মরুদ্যানের কথা, যেখানে জন্মায় খেজুর গাছ ইত্যাদি।

এতো গেল সাধারণ মানুষের চিন্তার কথা। এবার একটু বলি বিশেষজ্ঞদের কথা। সাধারণভাবে বৃষ্টিহীন শিলা ও বালিময় বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে বলা হয় মরুভূমি। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় ছ'ভাগের এক ভাগ মরুভূমি। পৃথিবীর বুক-কাঁপানো মরুভূমিগুলির অবস্থান মোটামুটি ভাবে ক্রান্তীয় (কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি) অঞ্চলে। এইসব অঞ্চলে বাতাস শুখনো, মেঘ খুবই কম এবং বাষ্পীভবন (অর্থাৎ জল থেকে বাষ্প হওয়া) খুবই বেশি। পৃথিবীর কয়েকটি বিশাল মরুভূমি—যেমন মধ্য এশিয়া কিংবা উত্তর আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলের মরুভূমিগুলি বিরাট উঁচু পাহাড়ের আড়ালে বৃষ্টিহীন অঞ্চলে তৈরি হয়েছে। কারণ পাহাড়ের উচ্চতার জন্য অসহায় মেঘ পাহাড় ডিঙিয়ে বৃষ্টির ধারা বইয়ে দিতে পারে না এসব অঞ্চলে। তারই বিষময় ফল এই রুক্ষ তৃণহীন মরুভূমি। ক্রান্তীয় অঞ্চলের রুক্ষ মরুভূমিগুলির বিশেষত্ব মোটামুটি এইরকম ঃ

(ক) মরুভূমি অঞ্চলে গাছপালার অভাব। ফলে খুব তাড়াতাড়ি ভূমি ক্ষয়ে যায়।

(খ) মরুভূমি অঞ্চলে নদী-নালার আকাল। তাই জলের অভাবে মরুভূমির রুক্ষতা বেড়েই চলে।



সারা পৃথিবীতে যেখানে যেখানে মরুভূমি আছে

(গ) মরুভূমি অঞ্চলে ক্ষয়ের প্রধান মাধ্যম হাওয়া। আর এই হাওয়া-বাহিত বালিকণা থেকেই তৈরি হয় বালিয়াড়ি (sand dune)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঞ্চলে প্রায় 150 মিটার উঁচু বালিয়াড়ি দেখা গেছে।

প্রকৃতি অনুযায়ী তিন রকমের মরুভূমি রয়েছে পৃথিবীতে :

(1) **শিলাময় মরুভূমি** (rocky desert) : গাছপালাহীন এ ধরনের শিলাময় মরুভূমির প্রান্তরে ইতস্তত সামান্য নুড়ি কিংবা বালি ছড়ানো। উদাহরণ—সাহারা মরুভূমির হামাদা (**Hamada**) অঞ্চল।

(2) **কংকরময় মরুভূমি** (stony desert) : প্রচুর কাঁকর কিংবা নুড়ি ছড়ানো মরুভূমি। যেমন, আলজিরিয়ায় সাহারার 'রেগ' অঞ্চল। জরডনের মরুভূমি।

(3) **বালিময় মরুভূমি** (sandy desert) : বালিময় বিস্তীর্ণ মরুভূমি। প্রচুর বালিয়াড়ি (sand dune) থাকে। উদাহরণ—সাহারার এর্গ (erg) অঞ্চল, রাজস্থানের থর মরুভূমি।

অনেকের ধারণা, মরুভূমি মানেই প্রচণ্ড গরম জায়গা। তা' কিন্তু সবসময় সত্যি নয়। শীতকালে কোনো কোনো মরুভূমিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডাও পড়ে। যেমন মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমি। এখানে শীতের সময় তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্যের কাছাকাছি। কিন্তু গরমের সময় তাপমাত্রা উঠে আসে 40-60 ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

মরুভূমির গাছপালার মধ্যে রয়েছে নানা জাতের ক্যাকটাস, যা কম জলে বেঁচে থাকতে পারে। ছোট গাছ হলেও এদের শিকড় প্রায় 15 মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। মরুভূমির প্রাণীদের মধ্যে ইঁদুর, বাদুড়, শেয়াল, খরগোশ, বাজপাখি, কাঠবিড়ালী, হরিণ, কচ্ছপ, গিরগিটি ও কয়েক জাতের সাপের কথা বলতেই হয়।

পৃথিবীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মরুভূমির আয়তন ও অবস্থান

মরুভূমির নাম	দেশ / অঞ্চল	আয়তন (বর্গমাইল)
সাহারা	উত্তর আফরিকা	35,00,000
লিবিয়া	উত্তর আফরিকা	6,50,000
অস্ট্রেলীয়	অস্ট্রেলিয়া	6,00,000
গোবি	মঙ্গোলিয়া	4,00,000
রুব আল খালি	আরব	2,50,000
কালাহারি	বটসওয়ানা	2,00,000
গ্রেট স্যানডি	অস্ট্রেলিয়া	1,60,000
গ্রেট ভিক্টোরিয়া	অস্ট্রেলিয়া	1,25,000
সিরিয়া	আরব	1,25,000
টাকলা মাকান	চীন	1,25,000
আরুনটা	অস্ট্রেলিয়া	1,20,000
কারাকুম	দক্ষিণ-পশ্চিম তুর্কী	1,05,000
নবিয়ান	উত্তর আফ্রিকা	1,00,000
কিজিল কুম	মধ্য তুর্কী	90,000

দশঃ সমুদ্র

পৃথিবীর মানচিত্রে মাপজোপ করলে দেখা যাবে, পাঁচটা মহাসমুদ্র আর ছেষট্টিটা সমুদ্র মিলিয়ে পৃথিবীর প্রায় একাত্তর ভাগ অংশই জলে ঢাকা আর বাদবাকিটা ডাঙা অর্থাৎ মহাদেশ। সমুদ্র যে কত বড় (36,10,00,000 বর্গ কিমি) তা' অনেকটাই মালুম হয় সমুদ্রের পাড়ে বসে চোখ দু'টো সামনে মেলে দিলে। শুধু আকারেই বড় নয়, গভীরও দারুণ। কোথাও কোথাও এত গভীর যে আমাদের ডাঙার সবচেয়ে উঁচু পাহাড় হিমালয়কে ছেড়ে দিলে তার কিছুই আর দেখতে পাওয়া যাবে না। তাই মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, এত বিশাল গভীর সমুদ্র তৈরি হলো কেমন করে !

এই প্রশ্নটা শুধু সাধারণ মানুষের মনকেই নয়, ভূ-বিজ্ঞানীদের চিন্তাকেও বেশ নাড়া দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য মতবাদটি বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইনের ছেলে জর্জ ডারউইনের। ওর মতে প্রথম সৃষ্টির পরে সূর্যের টানে পৃথিবীর তরল বুক থেকে খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল মহাকাশে। সেই উপড়ে চলে যাওয়া অংশটা চাঁদ। এরই ফলে পৃথিবীর বুকে তৈরি হলো এক বিরাট গর্ত, যার নাম প্রশান্ত মহাসাগর। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা এ তত্ত্বকে অবিশ্বাস্য বলে বাতিল করেছেন।

মহাসাগর সৃষ্টির ব্যাপারে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তত্ত্বটি ভূবিজ্ঞানী ওয়েগনারের (1880-1930)। 1912 সালে প্রচারিত এই তত্ত্বটির কথা আগেই বলেছি। ওই তত্ত্ব অনুসারে বলতে হয় প্যানজিয়া মহাদেশ ভেঙ্গে সরে গিয়ে তৈরি করেছে আজকের সব মহাসাগর। গর্ত ভরাট হয়েছে মেঘ থেকে বৃষ্টির ফলে।

বিজ্ঞানীদের মতে এই জলীয় বাষ্পের বেশির ভাগটাই বেরিয়ে এসেছে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে।

সমুদ্রের ওপরের চেহারাটা দেখে মনে হয় সমুদ্রের তলের চেহারাটা বুঝি সমান মসৃণ। উনিশ শতকে কিছু মানুষেরও একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল। সমুদ্রের তলদেশ বোধহয় চৌবাচ্চার মেঝের মতো সমান মসৃণ।

কিন্তু সমুদ্রের তলদেশ মোটেই সমান বা মসৃণ নয়। সমুদ্রের তলায়ও রয়েছে অনেক ডুবো পাহাড়।

নানারকম সমীক্ষা থেকে যতটুকু জানা গেছে, সেই তথ্যের ভিত্তিতে সমুদ্রতলকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

(1) মহাদেশের লাগোয়া অঞ্চল (continental margin),

(2) সমুদ্রতলের মেঝে (ocean basin floor) ও

(3) সামুদ্রিক শৈলশিরা (oceanic ridge)।

(1) **মহাদেশের লাগোয়া অঞ্চল** : সব মহাদেশকে ঘিরে রেখেছে মহীসোপান বা মহাদেশীয় সোপান (continental shelf)। সমুদ্র এখানে একেবারেই গভীর নয়। আর সমুদ্রের তলাটাও মোটামুটি মসৃণ। তবে সব উপকূলের মহীসোপান কিন্তু সমান চওড়া বা গভীর নয়। কোথাও চওড়ায় মাত্র কয়েকশ মিটার, আবার কোথাও বা কয়েকশ কিলোমিটার। গভীরতা সম্বন্ধেও একই কথা। কোনো কোনো মহীসোপান মাত্র 20-30 মিটার গভীর, আবার কোথাও 600 মিটার গভীরতাও দেখা গেছে। তবে মোটামুটিভাবে মহীসোপানের গড় গভীরতা প্রায় 150 মিটার। মহাদেশের নদীগুলি ক্রমাগত যে পলি এনে সমুদ্রে ফেলে, তা' থেকেই তৈরি হয়েছে মহীসোপান অঞ্চল। সমুদ্রের অংশ হলেও ডাঙার চরিত্রের সঙ্গে অনেক মিল। সূর্যের আলো পৌঁছয় বলে শতকরা নব্বই ভাগ সামুদ্রিক প্রাণী আর গাছপালার ভিড় এখানে।

মহীসোপানের শেষ যেখানে, মহীঢাল বা মহাদেশীয় ঢালের (continental slope) শুরু সেখানে। বলতে গেলে আসল সমুদ্রের শুরু এখান থেকেই। এরপর সমুদ্রতল অনেকটা গড়ানে ঢালে নেমে গেছে 200-250 মিটার গভীরে। এই অঞ্চলের গড়পড়তা ঢাল 20-30 ডিগ্রির মধ্যেই। এখানকার চেহারাটা স্থলভূমির চেয়ে অনেকটাই আলাদা। গাছপালা দেখা যায় না, বালির বদলে পাওয়া যায় ধূসর সবুজ অথবা নীল রঙের কাদা। মহাদেশীয় ঢালের গড়

গভীরতা তিন-চার হাজার মিটার হলেও, কোনো কোনো জায়গায় তা' ন'-দশ হাজার মিটারও হতে পারে।

(2) **সমুদ্রতলের মেঝে ঃ** মহাদেশীয় ঢাল ধরে নাক বরাবর নিচে নেমে গেলেই পৌঁছনো সম্ভব সমুদ্রের তলদেশে। কোনো সন্দেহ নেই, এটিই হলো সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর অঞ্চল। গড় গভীরতা 4000 মিটার। এখানে সমুদ্রের তলদেশ কিন্তু মোটেই মসৃণ সমতল নয়, বরং কোথাও কোথাও মহাদেশের চেয়েও বেশি এবড়ো-খেবড়ো। ডাঙার মতো এখানেও রয়েছে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি, বহু পাহাড়, শৈলশিরা, বিস্তীর্ণ ফাটল ও গভীর খাত (trenches)। কোনো সন্দেহ নেই, এই গভীর খাতগুলিই পৃথিবীর গভীরতম অঞ্চল। এদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা গভীর খাতটি হলো প্রশান্ত মহাসাগরে ফিলিপাইনস দ্বীপপুঞ্জের পূবদিকে ও নিউ গিনির উত্তরে মারিয়ানা খাত (Mariana trench)। এর সবচেয়ে গভীর বিন্দুটি 11,035 মিটার নিচে। আজ পর্যন্ত যতটা জানা গেছে, তাতে বলা চলে এটিই পৃথিবীর গভীরতম বিন্দু। গভীর সমুদ্র এলাকায় এ পর্যন্ত 23টি খাতের সন্ধান মিলেছে, যার মধ্যে 18টি রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। অন্যান্য খাতের মধ্যে যেসব খাতের নাম জানতেই হয়, তারা হলো জাভা (7,450 মি), ফিলিপাইন (10,265 মি), ইজু-বনিন (9,810 মি), টঙ্গা (10,822 মি), কারমাডেক (10,047 মি), আটাকামা (8,064 মি), কুরিল-কামচাটকা (10,542 মি), অ্যালিউশিয়ান (7,422 মি) ও পোয়েটো-রিকো (8,385 মি)।

(3) **সামুদ্রিক শৈলশিরা অঞ্চল ঃ** পৃথিবীর সব সমুদ্র জুড়ে রয়েছে যে দীর্ঘ পর্বতমালা বা শৈলশিরা, তার মোট দৈর্ঘ্য 65,000 কিলোমিটার, যা পৃথিবীকে প্রায় দেড়বার স্বচ্ছন্দে পাক দিতে পারে। সমুদ্রের সবচেয়ে দীর্ঘ শৈলশিরা মধ্য অতলান্তিক পর্বতমালা (Mid Atlantic ridge), যা ছড়িয়ে আছে আইসল্যাণ্ড থেকে কুমেরু পর্যন্ত প্রায় 16,000 কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জুড়ে।

অতলান্তিকের কোনো জায়গায় এই শৈলশিরা মাথা উঁচু করে দ্বীপের চেহারা নিয়েছে, যদিও এর বেশির ভাগটাই এখন জলের নিচে। সমুদ্রতল থেকে অধিকাংশ চূড়ার উচ্চতাই 1500 থেকে 3500 মিটারের মধ্যে।

অতলান্তিকের মতো প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরেও বেশ কিছু পর্বতমালার হদিশ মিলেছে, যদিও আকারে তেমন বড় নয়। প্রশান্ত মহাসাগরের তলার পর্বতমালাও কোথাও কোথাও দ্বীপ হিসেবে জেগে উঠেছে।

এপার ঃ নদনদী

পৃথিবীতে প্রথম যেদিন মেঘ থেকে বৃষ্টি নামলো, সেদিন থেকেই নদনদীরও যাত্রা শুরু। তারপর থেকে পৃথিবীর পিঠে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য খাত বেয়ে বৃষ্টির জল বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। যে অঞ্চল দিয়ে নদী বয়ে গেছে, তার দুপাশের রুক্ষ জমি ক্রমেই নদীর নরম পলিতে উর্বর হয়ে উঠেছে। পাহাড় থেকে তৈরি হয়েছে মাটি। মাটির ওপরে বেড়ে উঠেছে অরণ্য তার লতাপাতা ফলমূল নিয়ে। এ প্রায় একশ কোটি বছর আগের কথা। কিংবা আরো বেশি হতে পারে।

এই ঘটনার আরো অনেক পরে পৃথিবীতে এসেছে মানুষ। নিজের প্রয়োজনে মানুষ ব্যবহার করেছে নদী। এই নদী মানুষের স্নেহময়ী জননীর মতো। নদী প্রাণ প্রবাহিনী। তাই বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু ঋষি ও কবির রচনায় নদীর বন্দনা গান বারবার উচ্চারিত। সারা পৃথিবী জুড়ে কত যে গাথা-কাহিনী রচিত হয়েছে মাতৃময়ী জলদায়িনী নদীকে কেন্দ্র করে, তার আর শেষ নেই।

বাংলা ভাষায় নদীর অনেক নাম। তটিনী, তরঙ্গিনী, নির্ঝরিণী, প্রবাহিনী, শৈবলিনী, সরিৎ, স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী, স্রোতোবহা এমনি আরো কত নাম।

নদীর জল যেমন সেচের প্রয়োজনে লাগে, তেমনি নদী-নালা বেয়ে বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ভ্রমণ করেছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। প্রথমে খাদ্যের প্রয়োজনে, পরে ব্যবসা বা সামাজিক প্রয়োজনে। সত্যি বলতে কি, সভ্যতার ইতিহাসে স্থলযানের চেয়েও বোধহয় আগে আবিষ্কৃত হয়েছে জলযান। এসব ছাড়া এখন নদীর গতিশীল জলপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে জলবিদ্যুৎ শক্তি।

সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক নদী। কোনটি লম্বায় বিরাট (নীলনদ), আবার

কোনোটি বা বিশাল পরিমাণ জল বহন করে চলেছে (আমাজন)। পৃথিবীর সব নদীর কথা বলার জায়গা এখানে নেই, তাই যেসব নদী দৈর্ঘ্য ও অববাহিকার (basin) আয়তনে উল্লেখযোগ্য, তারই একটা তালিকা দেওয়া হলো নিচে।

নদীর নাম	দৈর্ঘ্য		অববাহিকার আয়তন	
	মাইল	কিমি	বর্গমাইল	বর্গ কিমি
নীল নদ, আফরিকা	4,157	6,688	18,12,500	46,40,000
আমাজন, দক্ষিণ আমেরিকা	4,007	6,447	27,22,000	69,68,320
মিসিসিপি মিসৌরী, উত্তর আমেরিকা	3,860	6,219	12,43,700	31,13,872
ইয়াংসি, চীন	3,604	5,805	7,56,498	19,36,635
ওব, সোভিয়েট রাশিয়া	3,461	5,568	11,31,273	28,96,059
পীত নদী, চীন	2,902	4,669	4,86,486	12,45,404
কঙ্গো, আফরিকা	2,716	4,370	14,25,000	36,84,000
লেনা, সোভিয়েট রাশিয়া	2,653	4,268	9,36,293	23,96,910
ম্যাকেনজি, কানাডা	2,635	4,240	6,82,000	17,45 920
নাইজার, আফরিকা	2,600	4,183	5,80,000	14,84,800
আমুর-কেরুলেন, সোভিয়েট রাশিয়া	2,552	4,106	7,58,000	19,40,480
ইনেসি, সোভিয়েট রাশিয়া	2,485	3,998	10,45,173	26,75,643
রিয়োডিলা প্লাটা, দক্ষিণ আমেরিকা	2,349	3,780	16,79,535	42,99,610
ভোলগা, সোভিয়েট রাশিয়া	2,293	3,689	5,32,818	13,64,014
সেন্ট লরেন্স, উত্তর আমেরিকা	1,900	3,057	2,91,000	7,44,960
ব্রহ্মপুত্র, এশিয়া	1,800	2 896	3,61,000	9,24,160
সিন্ধু, ভারত/পাকিস্তান	1,800	2,896	3,72 000	9,52,320
দনিয়ুব, ইউরোপ	1,776	2,858	3,15,444	8,07,537
জামবেসি, আফরিকা	1,700	2,735	5,13,500	13,14,560
মারে, অস্ট্রেলিয়া	1,609	2,589	4,14,253	10,60,488
গঙ্গা, ভারত	1,578	2,539	3,36,486	8,61,404
ওরিনাকো, ভেনেজুয়েলা	1,281	2,061	3,50,000	8,96,000

নীল নদ ঃ নীল নদ পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। তবে সাম্প্রতিক কিছু মাপজোকের পর কেউ কেউ মনে করেন দক্ষিণ আমেরিকার আমাজনই পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। তবে এ ব্যাপারে এখনো কিছুটা সংশয় আছে। তবে একথা সত্যি, আমাজন নদী দিয়েই সবচেয়ে বেশি জল প্রবাহিত হয়।

নীল নদ কথাটি এসেছে ল্যাটিন নীলুস (Nilus) ও গ্রীক নীলোস (Nilos) শব্দ থেকে। এর অর্থ 'যার উৎস অজানা'। নীল নদের জন্ম আফরিকার ভিকটোরিয়া হ্রদের 65 কিলোমিটার পূর্বে, 2,500 মিটার উচ্চতায়। নীল নদের অববাহিকার আয়তন 46,40,000 বর্গ কিলোমিটার (18,12,500 বর্গ মাইল); যা আফরিকার মোট আয়তনের আঠারো ভাগের এক ভাগ।

উৎস থেকে যাত্রা শুরু করে নীল নদ উগাণ্ডা, কেনিয়া, তানজানিয়া, জাইরে, সুদান, ইথিয়োপিয়া ও ইজিপ্ট (মিশর) পেরিয়ে ভূমধ্যসাগরে মিশেছে।

তিনটি মূল জলধারা মিশে নীল নদের জন্ম। এদের মধ্যে প্রধানতম ব্লু নীল (Blue Nile) যার ভেতর দিয়ে নীল নদের মোট জলপ্রবাহের সাত ভাগের প্রায় চার ভাগই প্রবাহিত। ব্লু নীল নদের জন্ম ইথিয়োপিয়ায়। গুরুত্বের দিক থেকে হোয়াইট নীলের (White Nile) স্থান এর পরেই। তবে দৈর্ঘ্যে এই জলধারাটিই সবচেয়ে বড়। হোয়াইট নীলের উপনদীর মধ্যে রয়েছে বাহ্‌র এল আরব, লোল, জুর, আসোয়া ও সেলমিকি। ব্লু নীলের উপনদীর মধ্যে প্রধান দু'টি হলো দিনদার ও রাহাদ। ব্লু নীল ও হোয়াইট নীলের মিলন ঘটেছে সুদানের রাজধানী খারতুমে।

তৃতীয় জলধারা আটবারা মূল নদীর ধারার সঙ্গে মিশেছে আরো 200 কিলোমিটার উত্তরে। আটবারা নদীর অববাহিকার মধ্যে পড়েছে ইথিয়োপিয়ার উত্তর-পশ্চিম অংশ। বর্ষার সময় ব্লু নীল ও আটবারা নদী নিয়ে আসে প্রচুর পলি, যাতে গঠিত হয়েছে মিশর ও সুদানের শস্য শ্যামল ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। কেবলমাত্র নীল নদের জলের ওপরেই সমস্ত অঞ্চলের সেচের কাজ নির্ভরশীল। ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে নীল নদের অনেকটাই নাব্য, বিশেষত সমুদ্র থেকে 1,500 কিলোমিটার দূরে ওয়াদি হালফা শহর পর্যন্ত। আসওয়ান বাঁধ ও অন্যান্য ব্যারেজ পেরোতে লক গেট ব্যবহার করতে হয়। ওয়াদি হালফা ও খারতুমের মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি জলপ্রপাতও। 53 মিটার উঁচু আসোয়ান বাঁধের দৈর্ঘ্য প্রায় দু' কিলোমিটার। এর জলাধারে প্রায় 480 কোটি মেটরিক টন জল ধরে রাখা সম্ভব।

সেচের সুবিধের জন্য নীল নদ থেকে বহু খাল কাটা হয়েছে। নীল নদের জলে যা চাষ হয়, তার মধ্যে বলতে হয় কার্পাস, গম, বার্লি, আখ, বাদাম, যব, তিল, ভুট্টার কথা। এদের মধ্যে অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফসল কার্পাস, যা মোট কৃষিক্ষেতের চার ভাগের এক ভাগ অংশে চাষ হয়। তুলোর জিনিসপত্রই মিশরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য।

আসোয়ান বাঁধ থেকে শুরু করে কায়রো পর্যন্ত নীল নদের দু'পাশে বিস্তৃত পলিভূমি। এই পলিভূমি কোথাও কোথাও 20 কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া। নীল নদ থেকে খাল কেটে এই পলিভূমিতে চাষবাস করা হয়। এই পলিভূমির সীমানার বাইরেই রুক্ষ মরুভূমি। এই মরুভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত একেবারে হয় না বললেই চলে। তবে যেখানে অল্পস্বল্প বৃষ্টি হয়, সেখানে কাঁটা ঝোপ বা অ্যাকাশিয়া জাতীয় গাছপালা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না। আটবারা ছাড়িয়ে আরো দক্ষিণে গেলে চোখে পড়বে সাভানা তৃণভূমি। এখানে বেশ বড় লম্বা লম্বা ঘাস জন্মায়। প্রায় দু'-তিন মিটার লম্বা। বৃষ্টির জলে ঘাস বড় হয়ে ওঠে আর শুখনোর সময় সব ঘাস মরে যায়। এখানে নদীর বুকে গজায় নল খাগড়ার জঙ্গল, প্যাপিরাস, জল লেটুস—আরো কত কী।

আমাজন ঃ দক্ষিণ আমেরিকার দীর্ঘতম নদী আমাজন। তবে জলের আয়তন ও অববাহিকার আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী। কারো কারো মতে আমাজন পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীও বটে। ওঁদের হিসেবে আমাজন নদীর দৈর্ঘ্য 4,195 মাইল (6,750 কিমি.)। তবে সবাই এ হিসেব মানেন না। আমাজন নদীর জন্ম প্রশান্ত মহাসাগর থেকে 160 কিলোমিটার ভেতরে মধ্য পেরুর আনদিজ পর্বতে। পেরু ও ব্রাজিলের ভেতর দিয়ে 4,007 মাইল (6,447 কিমি.) পথ অতিক্রম করে বিষুব রেখার কাছে অতলান্তিকে পড়েছে আমাজন। দক্ষিণ আমেরিকার মোট আয়তনের দশ ভাগের চার ভাগ অংশই আমাজন অববাহিকার মধ্যে পড়ে।

উৎস থেকে শুরু করে ইকুইটস পর্যন্ত আমাজনের নাম মারানন (পরতুগিজ শব্দ)। সেখান থেকে সাগর পর্যন্ত নাম আমাজোনাস বা আমাজন। এই নামকরণ করেছেন পর্যটক ওরেল্লানা 1541 সালে।

আমাজন নদীর জলপ্রবাহের আয়তন কখনোই নির্ভুলভাবে মাপজোক করা হয় নি। তবে বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে অনুমান করা হয়েছে, এর জলপ্রবাহের গড় পরিমাণ 42,00,000 কিউসেক (প্রতি সেকেণ্ডে ঘন ফিট),

যা মিসিসিপি নদীর জলপ্রবাহের প্রায় সাত গুণ। বর্ষাকালে জলপ্রবাহের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে হয় 70,00,000 কিউসেক। একটি হিসেব থেকে জানা যায়, পৃথিবীপৃষ্ঠে যত জল প্রবাহিত হয়, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগই প্রবাহিত হয় আমাজন নদীখাত দিয়ে। আমাজন নদীতে এত জলপ্রবাহের প্রধান কারণ, আমাজন নদীর অববাহিকার অবস্থান বৃষ্টিপ্রধান নিরক্ষরেখীয় অঞ্চলে। আমাজন নদীর অববাহিকা অঞ্চল মূলত ব্রাজিলের মধ্যে পড়লেও এর কিছু কিছু অংশ পড়েছে পেরু, বলিভিয়া, ইকোয়েডর, কলমবিয়া ও ভেনেজুয়েলাতে।

নদীর মোহনা থেকে 2,300 মাইল ভেতরে ইকুইটস পর্যন্ত বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করতে পারে। আর ছোট জাহাজ যেতে পারে আরো 486 মাইল (781 কিমি.) ভেতরে পঙ্গো ড মানকোরিকে পর্যন্ত।

সত্যি বলতে গেলে আমাজন যেন একটি নদী নয়, অসংখ্য উপনদী মিলিয়ে বহমান এক বিশাল জলধারা। আমাজনের উপনদীগুলির মধ্যে যাদের নাম করতেই হয়, তারা হলো টোকানটিন্স, জিংগু, টাপাজোঁ, মাদিরা, পুরুজ, জুরুয়া, পুটুমায়ো, জাপুরা, নেগরো, ব্রানকো ইত্যাদি।

আমাজন নদী উপত্যকার জন্ম শিলাচ্যুতির ফলে। টারশিয়ারি যুগে নদীবাহিত পলিতে ভরাট হয়ে আজকের উপত্যকা তৈরি হয়েছে। আমাজন নদীর মতো এত বিরাট মোহনা পৃথিবীতে বিরল।

আমাজন নদী উপত্যকায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের জন্য জন্ম নিয়েছে এক চিরসবুজ ঘন অরণ্য। এই অরণ্যে রয়েছে অসংখ্য রকমারি বৃক্ষ। বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী লুই আগাসিজ মাত্র আধ মাইল বর্গ এলাকায় দেখতে পেয়েছেন একশ সতেরো রকমের গাছপালা। আকাশ থেকে এই অঞ্চলের বিচিত্র অরণ্য দেখলে মনে হবে কে যেন বিছিয়ে রেখেছে এক অন্তহীন সবুজ কারপেট। এই অরণ্যে রয়েছে পাম, অ্যাকাসিয়া, শিরীষ, রবার, ডুমুর, কুইনিন, কাকাও, কাসাভা ইত্যাদি নানারকমের গাছ। এই অঞ্চলে প্রচুর জন্তু জানোয়ার থাকলেও বড় আকারের স্তন্যপায়ী জানোয়ার প্রায় নেই বললেই চলে। নদীর জলে প্রায় হাজার দু'য়েক বিভিন্ন প্রজাতির মাছও রয়েছ।

আমাজন নদী অঞ্চলে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত, সমৃদ্ধ অরণ্য ও বিচিত্র প্রাণী থাকলেও জনসংখ্যা খুবই কম। অবশ্য বিভিন্ন যুগে এই অঞ্চলে আগমন ঘটেছে অসংখ্য পর্যটকের। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লা কনডামাইন, আলেকজানডার হামবোল্ট,

কার্ল ফন মারটিয়াস, রবার্ট স্কমবার্গ, হার্নম, হেনরি লিসটার, উইলিয়াম স্মিথ ইত্যাদি নাম। এখন জঙ্গল কেটে নতুন উপনিবেশ তৈরি হচ্ছে প্রতিদিন।

মিসিসিপি-মিসৌরি ঃ দৈর্ঘ্যের দিক থেকে মিসিসিপি মিসৌরি নদী পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়। বাহিত জলের পরিমাণের হিসেবে পঞ্চম। নদী-অববাহিকার আয়তনের হিসেবেও পঞ্চম। মিসিসিপি-মিসৌরির যৌথ দৈর্ঘ্য 6,210 কিলোমিটার। মিসিসিপির জন্ম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা প্রদেশের ইটাসকা হ্রদের কাছে। কেবলমাত্র মিসিসিপির দৈর্ঘ্য 2,350 মাইল (3,780 কিমি.)। মিসিসিপির প্রধান উপনদী মিসৌরি। এর জন্ম রকি পাহাড়ে। অববাহিকার আয়তন 13·7 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। মিসৌরির উপনদীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইয়োলোস্টোন ও প্লাট নদী। প্লাট নদীর জন্ম উয়েমিং প্রদেশে হলেও এর বেশির ভাগটাই নেবরাসকা প্রদেশের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। এর দৈর্ঘ্য 1,400 মাইল (2,253 কিমি.)। ওমাহা শহরের কাছে মিসৌরি নদীর সঙ্গে মিশেছে। মিসিসিপির অন্যান্য উপনদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্বদিক থেকে আসা ওহিও নদী। ওহিও নদীর জন্ম পেনসিলভ্যানিয়া প্রদেশে মনঙ্গাহেলা ও অ্যালিঘেনি নদীর মিলনে। এর দৈর্ঘ্য 980 মাইল (1,576 কিমি)। ওহিও নদীর প্রধানতম উপনদী 782 মাইল (1,258 কিমি.) দীর্ঘ টেনিসি। টেনিসি নদীর অববাহিকায় আগে প্রায়ই বন্যা হতো। পরে টেনিসি ভ্যালি অথরিটি গঠন করে বহু বাঁধ দেওয়া হয়েছে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য। এই টেনিসি ভ্যালি অথরিটির আদলেই ভারতে গঠিত হয়েছে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন। পশ্চিমদিক থেকে আর দু'টি বড় উপনদী মিশেছে মিসিসিপির সঙ্গে। আরকানসাস ও রেড নদী। আরকানসাসের জন্ম রকি পাহাড়ে। এর বুকে উনিশটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে। রেড নদীর দৈর্ঘ্য 1,600 মাইল (2,574 কিমি.)। নদীর নাম রেড, কারণ নদীর উজানে রয়েছে প্রচুর লাল মাটি।

মিসিসিপি-মিসৌরি নদীর পারে যেসব শহর গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিউ অরলিয়েন্স বন্দর, ব্যাটন রুজ, মিনিপোলিস, মেমফিস, সেন্ট লুই, কানসাস সিটি ইত্যাদি।

মিসিসিপি-মিসৌরির সব উপনদী মিলিয়ে বেশ বড়সড় একটি নদীপথও গড়ে উঠেছে। মোট দৈর্ঘ্য প্রায় 19,885 কিলোমিটার। এই নদীপথে বছরে প্রায়

2,500 লক্ষ মেট্রিক টন মাল পরিবাহিত হয়। ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের কাজে এই নদীপথ ক্রমেই খুব জমজমাট হয়ে উঠছে।

ইয়াংসি নদী ঃ পৃথিবীর চতুর্থ দীর্ঘ ও চীনের দীর্ঘতম নদী ইয়াংসি। চীনা ভাষায় এর অর্থ ইয়াং গ্রামের নদী। তিব্বতের মালভূমিতে কুনলুন পর্বতের দক্ষিণ ঢালে 17,000 ফিট (5,185 মি.) উচ্চতায় ইয়াংসি নদীর জন্ম। উৎস থেকে বেরোবার পরে অনেকটা অংশেই নদীটি খুবই খরস্রোতা। পাহাড়ী অঞ্চল হওয়ায় নদীখাতের ঢাল খুবই বেশি। এখানে যে কয়েকটি উপনদী মিশেছে ইয়াংসির সঙ্গে, তাদের মধ্যে বলতে হয় ইয়া লুং, মিনি চিয়াং, টো চিয়াং, উ চিয়াং এবং হান স্থই নদীর কথা। হ্যাংকৌর কাছে ইয়াংসি নদীর ওপর 3,762 ফিট দীর্ঘ সড়ক ও রেলব্রিজ তৈরি হয়েছে 1957 সালে।

উ-হানের পর নদী-খাতের ঢাল অনেক কমে এসেছে। এই অংশে প্রাচীন কয়েকটি পর্বতমালা পেরোতে হয়েছে এই নদীকে। আর এই অঞ্চলেই দক্ষিণ থেকে বয়ে আসা বেশ কয়েকটি উপনদীও মিলিত হয়েছে ইয়াংসির সঙ্গে। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কান চিয়াং নদী, যা ইয়াংসির সঙ্গে মিলিত হয়েছে চিউচিয়াংয়ের কাছে। বন্দর শহর সাংহাইয়ের সঙ্গে ইয়াংসির যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে একটি খালের (ক্যানাল) সাহায্যে।

চীনের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী হোয়াং হো (পীত নদী) নদীর মতো বন্যাজনিত সমস্যা ইয়াংসিতে কম। তবে বেশি বৃষ্টি হলে মাঝে মাঝে ইয়াং নদীতেও বন্যা হয়। যেমন, 1931 এবং 1958 সালে ইয়াংসি নদীর বন্যা চারদিক ভাসিয়েছিল। 1931 সালের বন্যায় এক বিরাট এলাকা (যার আয়তন প্রায় 35 হাজার বর্গ মাইল) জলের তলায় ডুবে গিয়েছিল। একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ইয়াংসি নদী প্রতি বছর একশ কোটি টন পরিমাণ পলি সমুদ্রে ফেলে।

চীনের মানুষজন ইয়াংসি নদীকে বহুদিন ধরেই জলপথ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত পর্যটক মারকো পোলো চীন দেশে এসে ইয়াংসি নদীতে নানারকম জলযানের প্রাচুর্য দেখে অবাক হয়েছিলেন। এখনো বছরের মধ্যে আট মাসই ইয়াংসি নদী নৌ-চলাচলের উপযোগী থাকে।

বিগত শতাব্দীতে ইয়াংসি নদী রাজনৈতিক দিক থেকে ইংরেজদের অধীনে ছিল। পরে চীন-জাপান যুদ্ধের সময় (1937—45) ইয়াংসি নদীর 1600 কিলোমিটার জলপথ জাপান অধিকার করে নেয়। 1949 সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ 'অ্যামিথিস্ট' নানকিং-এ যাওয়ার পথে চীনা কমিউনিস্ট

বাহিনীর আক্রমণে তিন মাস আটকে পড়ে ছিল। কিন্তু মানবিক সেবাকাজে নিয়োজিত ছিল বলে জাহাজটিকে পরে সমুদ্রে ফিরে যেতে দেওয়া হয়।

রাইন ঃ ইউরোপের দীর্ঘতম নদী ভোলগা হলেও, পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নদী রাইন। জন্ম সুইজারল্যাণ্ডের কনস্ট্যান্স হ্রদে। উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে সুইজারল্যাণ্ডের বেসল শহর পর্যন্ত পৌছতে নদীটি পাহাড় থেকে প্রায় 122 মিটার নিচে নেমে এসেছে। রাইন নদীর মোহনা থেকে বেসল শহর পর্যন্ত এই 880 কিলোমিটার দূরত্ব নৌ-চলাচলের উপযোগী। ফলে শিল্পনগরী বেসলে গড়ে উঠেছে এক বড় নদীবন্দর। এই অঞ্চলে তাই তৈরি হয়েছে কয়েকটি ব্যারেজ ও বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্র।

বেসল শহরে পৌছে রাইন নদী হঠাৎ বাঁক নিয়েছে উত্তর দিকে। তারপর ফ্রান্স ও জারমানির সীমানা ধরে লাকনেমবার্গ পর্যন্ত বয়ে গিয়ে প্রবেশ করেছে হল্যাণ্ডে। আরো খানিকটা পথ পেরিয়ে রাইন নদী দু'টি শাখা নদীতে আলাদা হয়ে গেছে। একটি ওয়াল, অন্যটি ইজসেল (জুইডার জী)। এদের মধ্যে প্রথমটি মোট জলপ্রবাহের তিন ভাগের দু'ভাগ নিয়ে উত্তর সাগরে (North sea) মিশেছে।

উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত এই দীর্ঘপথে অনেক উপনদীই মিশেছে রাইনের সঙ্গে। তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল, নেকার, নাহে, লাহ্‌, মেকসেলি। এইসব উপনদীর জলবহনের ক্ষমতা নেহাৎ কম নয়। তবে নদীতে জোয়ার-ভাটার জন্য বছরে প্রায় মাসখানেক ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে।

নৌ-চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে রাইন নদী পৃথিবীর অন্যান্য নদী থেকে অনেকটা এগিয়ে আছে, 'একথা সহজেই বলা যায়। কারণ বহুকাল ধরেই রাইন নদী বয়ে চলেছে এক জনবহুল সমৃদ্ধ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে। কিংবা কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায়, রাইন নদীর জন্যই এই অঞ্চলের এত বাড়বাড়ন্ত। তাছাড়া রাইন নদীর মোহনার বিপরীতেই গ্রেট-ব্রিটেন ও অন্যান্য কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ থাকায় এই সমুদ্রপথও সদাব্যস্ত কর্মচঞ্চল। এছাড়া অ্যান্টওয়ার্প ও আমস্টারডামের মতো শহরের সঙ্গেও খালের মাধ্যমে যোগাযোগ রয়েছে। এই নদীপথে যে সব জিনিসপত্র আমদানি-রপ্তানি হয় তাদের মধ্যে রয়েছে দানাশস্য। আকরিক, কয়লা ও পেটরোলিয়াম জাত দ্রব্য। প্রতি বছর নদীপথে এভাবে প্রায় 2500 কোটি মেটরিক টন জিনিসপত্র পরিবহন করা হয়।

রাইন নদী ও এর খালের ধারে ধারে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রও বসানো হয়েছে নানা প্রয়োজন মেটাতে।

কঙ্গো নদী ঃ আফরিকার দীর্ঘতম নদী কঙ্গো। এখন অবশ্য এর নাম জাইরে নদী। অবস্থান নিরক্ষরেখীয় অঞ্চলে। বৃষ্টিপাত প্রচুর। তাই এই নদী ও তার উপনদীগুলিতে সারা বছরই জল থাকে। ফলে অধিকাংশ নদীই বছরের বেশির ভাগ সময় নৌ-চলাচলের উপযোগী।

তবে উজানের দিকে পাহাড়ী অঞ্চলে এই নদীর বুকে রয়েছে বহু জলপ্রপাত। এর মধ্যে লিভিংস্টোন (213 মিটার উঁচু) ও স্টানলি (244 মিটার উঁচু) জলপ্রপাত দু'টির নাম উল্লেখযোগ্য। যে সব শহর ও নদীবন্দর কঙ্গো নদীর দু' তীর জুড়ে গড়ে উঠেছে, তারা হলো বাসাকো, কিসানগানি, বানডাকা, ইরেবু, কিনসাসা, মাটাদি, মোমা, বানানা ইত্যাদি। বড় ষ্টিমার চলতে পারে সমুদ্র থেকে মাটাদি শহর পর্যন্ত। মাটাদি থেকে মালেবো পর্যন্ত বেশ কিছু জলপ্রপাত থাকায় এই অংশ নৌ-চলাচলের উপযোগী নয়। তবে এর পর থেকে বোয়োমা জলপ্রপাত পর্যন্ত কঙ্গো নদী মোটামুটি নাব্য।

গঙ্গা ঃ ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী গঙ্গা। এই নদী ভারতের হৃদয়ের মতো। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছেন, ভারতের সব নদীর মধ্যে গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ নদী। ভারতের হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যায় এর বুকে কান পাতলে। তাই তো সভ্যতার শুরু থেকে গঙ্গা নদীর কাছে ছুটে এসেছে অগণিত লক্ষ মানুষ। উৎস থেকে শুরু করে সাগর পর্যন্ত গঙ্গার বয়ে চলা আসলে ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার কাহিনী। নানা সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস, নগরের উত্থান পতন, নানা মনীষীর চিন্তা, জীবনের পাওয়া না পাওয়া মানুষের জন্ম-মৃত্যু সবই জড়িয়ে আছে এই নদীর প্রবাহের সঙ্গে।

গঙ্গার সমতলভূমি ভারতের ভৌগোলিক আয়তনের মাত্র বারো শতাংশ এলাকা। কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিরিশ শতাংশ অধিবাসীই এই গঙ্গা সমতলভূমির বাসিন্দা।

গঙ্গার জন্ম উত্তর কাশী জেলার গঙ্গোত্রীতে, 7, 010 মিটার উঁচুতে। প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার প্রবাহিত হবার পর ঋষিকেশের কাছে গঙ্গা অবতরণ করে সমতলভূমিতে। আর তিরিশ কিলোমিটার নিচে হরিদ্বার। এলাহাবাদের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে যমুনা নদী। এখান থেকে 250 কিলোমিটার নিচে বারাণসী।

গঙ্গার উজানের দিকে মিশেছে রামগঙ্গা, গোমতী, টনস্ আর দক্ষিণ থেকে চম্বল (যমুনার উপনদী), বেতোয়া, সিনদা ও কেন।

বারাণসী থেকে 155 কিলোমিটার নিচে বিহারে প্রবেশ করেছে গঙ্গা। গঙ্গার এই মাঝের অংশে মিলিত হয়েছে ঘর্ঘরা, গণ্ডক, বুড়ি শোন, বাগমতী ও কোশীর মতো গুরুত্বপূর্ণ উপনদী। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় গঙ্গা'র একমাত্র উপনদী মহানন্দা।

রাজমহল থেকে 100 কিলোমিটার নিচে গঙ্গা দু'টি শাখায় বিভক্ত। একটি ভাগীরথী। তবে কালনার পরে এর নাম হুগলি। আর একটি শাখা পদ্মা, যা বেশ খানিকটা জায়গায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করছে।

বাংলাদেশের ভেতরে 220 কিলোমিটার নিচে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মায় সঙ্গে মিলিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র (অন্য নাম যমুনা)। আরো 100 কিলোমিটার নিচে মেঘনার সঙ্গে মিলনের পরে গঙ্গা মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

ব্রহ্মপুত্র নদ ঃ ব্রহ্মপুত্র বা সাংপোর জন্ম হিমালয়ের কৈলাস পাহাড়ে 5150 মিটার উচ্চতায়। মানস সরোবর হ্রদ ও ব্রহ্মপুত্রের উৎসস্থলের মধ্যে রয়েছে মরিয়াম লা গিরিদ্বার। হিমালয়ের প্রধান পর্বতশ্রেণীর সমান্তরাল খাতে তিব্বতের ভেতর দিয়ে 1700 কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে সদিয়ার কাছে ভারতে প্রবেশ করেছে ব্রহ্মপুত্র নদ। তারপর অরুণাচল প্রদেশ ও আসামের মধ্য দিয়ে 720 কিলোমিটার বয়ে গিয়ে ধুবড়ি শহরের কাছে ঢুকে পড়ে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে 279 কিলোমিটার পথ পরিক্রমার পর গোয়ালন্দের কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র। এই দু'টি মিলিত ধারার নাম পদ্মা। আরো 105 কিলোমিটার পরে মেঘনার সঙ্গে মিলন ঘটে পদ্মার। এই মিলিত ধারা মেঘনা নাম নিয়ে মিশেছে বঙ্গোপসাগরে।

তিব্বতে কয়েকটি উপনদী মিশেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। যেমন গাংছু। এর পারে দাঁড়িয়ে আছে তিব্বতের রাজধানী লাসা।

ভারতের মধ্যেও বেশ কয়েকটি উপনদী ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে। উত্তর দিক থেকে আসা উপনদীদের মধ্যে রয়েছে সুবনসিরি। কামেং বা জিয়া ভরেলি, মানস ও সংকোশ। দক্ষিণ থেকে এসেছে বুড়ি ডিহিং, ধানসিঁড়ি, কোপলি ও কালাং। এছাড়া তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা কল্যাণী ও রাইদক নদী ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিশেছে বাংলাদেশের ভেতরে।

বারো ঃ জলপ্রপাত

ভূবিজ্ঞানীর ভাষায়, পাহাড়ী খরস্রোতা নদী যখন চলতে চলতে উঁচু মালভূমি থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে পাহাড়ের খাদে তখনই সৃষ্টি হয় জলপ্রপাতের। সাধারণভাবে সব জলপ্রপাত এক মনে হলেও বিজ্ঞানীরা এদের তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। নদীখাতে জলের পরিমাণের ওপরই এদের কৌলিন্য নির্ভর করে। যে জলপ্রপাতের ঢাল তেমন বেশি নয়, তাকে বলা হয় র‍্যাপিড (rapid)। ছোট নাগপুরের পাহাড়ী অঞ্চলে এই ধরনের ছোটখাট জলপ্রপাতের দেখা আকছারই মেলে। আর যখন জলপ্রপাতের অজস্র ধারা পাথুরে সিঁড়ির ঢাল বেয়ে ধাপে ধাপে নেমে আসে চঞ্চলা বালিকার মতো, তখন তার নাম কাসকেড (cascade)। রাঁচির কাছাকাছি জোনহা জলপ্রপাতকে বোধহয় এই জাতের মধ্যে ফেলা যায়।

আর ক্যাটারাক্ট (cataract) ধরনের জলপ্রপাতের রূপ ভয়ংকর, ভয়ংকর সুন্দর। ফুলে ফেঁপে খরস্রোতে পাথরের বুকে ধাক্কা খেয়ে উত্তাল জলরাশি ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিচের অতল গহ্বরে। উত্তর অ্যামেরিকার উগুরাসু অথবা রোডেশিয়ার (আফ্রিকা) ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত মোটামুটিভাবে এই শ্রেণীতে পড়ে। বিশালতায় বা বিস্তৃতিতে তুলনামূলকভাবে ক্ষীণকায় হলেও রাঁচি থেকে 27 মাইল দূরের হুডরু জলপ্রপাতকে এই জাতের মধ্যে ধরা যায়। এছাড়া, রয়েছে কর্ণাটকের গেরসোপ্পা জলপ্রপাত, যা উঁচু মালভূমি থেকে প্রায় 850 ফিট নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ে সৃষ্টি করছে অপরূপ সৌন্দর্যের। তামিলনাড়ুর কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম জলপ্রপাতও (300 ফুট উঁচু) কম সুন্দর নয়। মহারাষ্ট্রের গোকক নদীর বুকে গোকক জলপ্রপাত (180 ফুট উঁচু), মধ্যপ্রদেশের নর্মদার বুকে জব্বলপুর জেলার ধুঁয়াধার জলপ্রপাত ও গিরিডির কাছে উশ্রী জলপ্রপাতের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যদিও মেঘালয়ের রাজধানী শিলংয়ের কাছাকাছি বিডন, বিশপ ও এলিফ্যান্ট জলপ্রপাতের নামডাকও কম নয়।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত ভেনেজুয়েলার এনজেল জলপ্রপাত (2700 ফুট)। আর সবচেয়ে বেশি জল বহন করে (4, 70, 000 কিউসেক) 374 ফুট উঁচু ব্রাজিল-প্যারাগুয়ের গুয়ারিয়া জলপ্রপাত। পৃথিবীর সবচেয়ে চওড়া জলপ্রপাত লাওসের খোন জলপ্রপাত—যা চওড়ায় 6·7 মাইল বা 10·7 কিলোমিটার।

তেরো ঃ হ্রদ

সৃষ্টির প্রথমদিন থেকেই নানারকম প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হয়েছে অগুনতি হ্রদের। প্রাগৈতিহাসিক যুগের হ্রদের অধিকাংশই মিলিয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। কোনো কোনো হ্রদ বুজে গেছে অতিরিক্ত পলি-পড়ে, আবার কোথাও বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পৃথিবীর বুক থেকে কোনো হ্রদ মুছে গেছে নিঃশেষে।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, পৃথিবীর বুকে হ্রদের সৃষ্টি নানা প্রাকৃতিক কারণে।

(এক) **ভূবিপর্যয় জনিত হ্রদ** (tectonic) ঃ ভূতাত্ত্বিক কারণে ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ বসে গেলে অথবা উঠে এলে কিংবা কোথাও ভাঁজ পড়লে ভূপৃষ্ঠে গহ্বর বা গর্ত সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষত নদীগর্ভের কোনো অংশ ওপরে উঠে বাধার সৃষ্টি হলে নদীর চড়াইয়ের দিকে হ্রদের জন্ম হতে পারে। কাশ্মীর ও কুমায়ুন (নৈনিতাল, ভীমতাল, তেওয়ানতাল) অঞ্চলের প্লায়াস্টোসিন যুগের (আজ থেকে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগের) বহু হ্রদ ও সুইজারল্যাণ্ডের জেনিভা ও কনস্ট্যান্স লেকের জন্ম খুব সম্ভবত এভাবেই। এছাড়া ভূমিকম্প ও শিলাচ্যুতির (fault) ফলেও হ্রদের সৃষ্টি হতে পারে।

গঙ্গার একটি উপনদীর বুকে শিলাচ্যুতির ফলে বিশাল ধস নেমে সাময়িক-ভাবে একটি হ্রদের সৃষ্টি করেছিল 1893 সালে। দক্ষিণ বঙ্গের অনেক খাল-বিলের জন্মও অনেকটা এভাবেই।

(দুই) **নদীউপত্যকাজাত হ্রদ** (flood plain) ঃ বহমান নদী ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করলে পরিত্যক্ত খাতেও হ্রদের সৃষ্টি হতে পারে। কাশ্মীরের উরাল ও ডাল হ্রদ খুব সম্ভবত এভাবেই ঝিলম নদীর পরিত্যক্ত খাতে গড়ে উঠেছিল।

(তিন) **আগ্নেয়গিরিজাত হ্রদ** (volcanic): অনেক সময় মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ জলপূর্ণ হয়ে সৃষ্টি হয় নয়ন মনোরম হ্রদের। যেমন, মহারাষ্ট্রের বুলদানা জেলার লোনার হ্রদ। এটির ব্যাস প্রায় দেড় কিলোমিটার ও গভীরতা নব্বই মিটার। সাম্প্রতিক কালে জিয়োলজিক্যাল সারভে অফ ইনডিয়ার ভূবিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেছেন, এটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ (crater) নয়। সম্ভবত আকাশের বুক থেকে ছুটে আসা উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট গহ্বর। ইতালিতে এ ধরনের বহু হ্রদ রয়েছে। আরেকটি উদাহরণ, ক্যামেরুনের নিয়স হ্রদ, যার কথা একটু আগেই বলেছি।

(চার) **হিমবাহজাত হ্রদ** (glacial): চলমান হিমবাহের ঘর্ষণে পাথরের গায়ে বিরাট গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এই গহ্বরগুলি হিমবাহের গলা জলে পরিপূর্ণ হয়ে সৃষ্টি করে হ্রদের। এ ধরনের বেশ কিছু হ্রদ রয়েছে হিমালয় অঞ্চলে।

(পাঁচ) **সমুদ্রজাত লোনা হ্রদ** (lagoon): লোনা জলের হ্রদের অবস্থান সমুদ্রের ধারে হয় বলে ভূবিজ্ঞানীদের ধারণা, এগুলো এককালে ছিল সমুদ্রের অংশ। কালক্রমে সমুদ্রের ঢেউয়ে বয়ে আনা বালি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লোনা জলের হ্রদে পরিণত হয়। কেরালার মালাবার উপকূলের বহু 'কয়াল' (lagoon এর মালয়ালম প্রতিরূপ), তামিলনাড়ুর কালিকট হ্রদ ও ওড়িশার চিলকা হ্রদ এই জাতের মধ্যেই পড়ে।

পৃথিবীর কয়েকটি বড় হ্রদের তালিকা

নাম	অবস্থান	আয়তন (বর্গমাইল)
(1) কাসপিয়ান	সোভিয়েত রাশিয়া / ইরান	1,43,550
(2) সুপিরিয়র	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র / কানাডা	31,820
(3) ভিকটোরিয়া নিয়াসা	উগাণ্ডা / তানজানিয়া / কেনিয়া	26,828
(4) আরল	সোভিয়েত রাশিয়া	25,300
(5) হুরন	কানাডা / আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	33,010
(6) মিশিগান	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	22,400
(7) টাঙ্গানিকা	জাইরে / তানজানিয়া / জামবিয়া	12,700
(8) গ্রেট বিয়ার	কানাডা	12,275
(9) বৈকাল	সোভিয়েত রাশিয়া	11,780
(10) নিয়াসা	মালয়ি / মোজাম্বিক	11,430

চোদ্দ ঃ শিলা

ভূত্বক (crust) তৈরি হয়েছে পাথর বা শিলা (rock) দিয়ে। এই পাথর আসলে কঠিন জৈব (organic) বা অজৈব (inorganic) পদার্থে তৈরি প্রাকৃতিক বস্তুপিণ্ড ছাড়া কিছু নয়। যদিও পাথর বলতে শক্ত গ্র্যানাইট পাথর থেকে শুরু করে নদীর নরম পলি সবই বোঝায়, তবু সাধারণ ভাবে পাথর বলতে আমরা শক্ত পাথরই বুঝি।

পৃথিবীর সব পাথরই তৈরি হয়েছে এক বা কয়েকটি খনিজ (mineral) মিলিয়ে। এই খনিজ মানুষের নানা কাজে লাগে। পৃথিবীর পাথর তিন রকমের (ক) আগ্নেয়শিলা (igneous rock), (খ) পাললিক শিলা (sedimentary rock) ও (গ) রূপান্তরিত শিলা (metamorphic rock)।

আগ্নেয়শিলা ঃ ভূত্বক যে সব পাথরে তৈরি, তার মধ্যে বেশির ভাগটাই আগ্নেয়শিলা। আগ্নেয়শিলা তৈরি হয় পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে ফাটলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা গরম তরল লাভা (lava) বা ম্যাগমা (magma) থেকে, নানা জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে।

ম্যাগমা, আসলে নানা ধরনের জটিল সিলিকেট পদার্থে তৈরি। এর অবস্থান ভূত্বকের নিচে ম্যাণ্টলে (mantle), তাই তাপমাত্রা (500 থেকে 1000° সেলসিয়াসে)। খুবই বেশি। এই ম্যাগমা বা লাভা ভূত্বকে পৌছে ঠাণ্ডা হতে হতে বেশ কিছু খনিজের জন্ম দেয়, তৈরি হয় আগ্নেয়শিলা। পৃথিবীর বুকে অহরহ আমরা যে সব আগ্নেয়শিলা দেখতে পাই তার মধ্যে উল্লেখ করতে হয় গ্র্যানাইট (granite), ব্যাসল্ট (basalt), গ্যাব্রো (gabbro), পেরিডোটাইট (peridotite) ইত্যাদি। গ্র্যানাইট পাথর খুবই শক্ত, তাকে ইটের সাইজে কাটা খুব শক্ত নয়। নানা রংয়ের বিচিত্র এই

পাথরে ভারতের বহু প্রাচীন মন্দির ও সৌধ তৈরি হয়েছে। বিশেষত মহাবলীপুরম, মাদুরাই, ত্রিচিনো-পল্লী, রামেশ্বরম ইত্যাদি জায়গার মন্দিরগুলি তৈরি হয়েছে এই গ্র্যানাইট পাথরেই।

ব্যাসল্ট এক ধরনের ঘন সবুজ বা কালো রংয়ের আগ্নেয়শিলা। অপ্রীতিকর রংয়ের জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণের কাজে এর তেমন চল নেই। তবে বোম্বাইয়ের কাছে কয়েকটি জায়গায় বিশেষ করে সলসেট দ্বীপে এক ধরনের হলুদ রংয়ের ব্যাসল্ট পাওয়া যায়। এই পাথর ঘরবাড়ি তৈরির কাজে অল্পস্বল্প ব্যবহৃত হয়। তবে সাধারণ ধরনের ব্যাসল্ট কাজে লাগানো হয় রাস্তাঘাট তৈরিতে। পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও বিহারের রাজমহলে প্রচুর ব্যাসল্ট পাওয়া যায়।

পাললিক শিলা ঃ সাধারণভাবে পাললিক শিলার জন্ম জলবাহিত পলি থেকে, তা' নদীরই হোক বা সমুদ্রের। নদী যে অঞ্চল দিয়ে বয়ে যায়, প্রাকৃতিক নিয়মেই সেই অঞ্চলের পাথরের কিছুটা অংশ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মিশে যায় নদীর জলে। যখন নদীর জলে পলির পরিমাণ খুব বেশি বেড়ে যায়, তখনই তা' জমা পড়ে কোন উপত্যকা বা হ্রদের তলদেশে। এভাবে জমাপড়া পলিই শক্ত কঠিন ও স্তরীভূত হয়ে জন্ম দেয় পাললিক শিলার। সমুদ্রের জল থেকেও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পলি জমে সমুদ্রের তলদেশে। গড়ে ওঠে সামুদ্রিক পাললিক শিলা। শুধু জল নয়, হাওয়ার মাধ্যমেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে গিয়ে পলি জমে তৈরি হতে পারে পাললিক শিলা।

পাললিক শিলার মধ্যে প্রথমেই মনে আসে বালিপাথর (sandstone), শেল (shale), চুনাপাথর (limestone) বা সৈন্ধব লবণের (rock salt) কথা। বালিপাথরের জন্ম জলের নিচে বালি জমে, আর মিহি কাদার স্তর শক্ত হয়ে তৈরি হয় শেল। সাধারণভাবে চুনাপাথরের জন্ম সমুদ্রের নিচে, তবে মহাদেশের ভেতরে বড় লেকের নিচেও গড়ে উঠতে পারে।

বালিপাথর থেকে মূর্তি, অট্টালিকা ও সাংসারিক প্রয়োজনের নানা জিনিস যেমন যাতা, শিল-নোড়া তৈরি হয়। বিন্ধ্যপর্বতের বিভিন্ন অংশ থেকে যে বালিপাথর পাওয়া যায়, তা' মোটামুটি ভালো জাতের, তাই নানা কাজে এর ব্যবহার। খাজুরাহোর মন্দির, সারনাথ, সাঁচীর বৌদ্ধস্তূপ, মোগলযুগের দিল্লী, আগ্রা ইত্যাদি জায়গার বহু বিখ্যাত সৌধ ও মসজিদ, নয়াদিল্লীর বহু সরকারী ভবন এই বালিপাথরেই তৈরি। এছাড়া চুনাপাথরে তৈরি হয় বাড়ি তৈরির উপাদান সিমেন্ট।

রূপান্তরিত শিলা : নাম শুনলেই বোঝা যায় এ ধরনের শিলার জন্ম অন্য শিলা থেকে রূপান্তরের ফলে। সত্যিই তাই। আগ্নেয়শিলা অথবা পাললিক শিলার অতিরিক্ত তাপ ও চাপের ফলে নতুন এক ধরনের শিলার জন্ম হয়। যেমন বালিপাথর থেকে কোয়ার্টজাইট, শেলপাথর থেকে স্লেট (slate), চুনাপাথর থেকে মারবেল।

স্লেট পাথরের সঙ্গে আমাদের সকলেরই প্রায় পরিচয় আছে, কেননা শিশু বয়সে কারই বা স্লেট-পেনসিলে প্রথম অক্ষরজ্ঞান হয় নি। মারবেল পাথরেই তৈরি হয়েছে আগ্রার তাজমহল, কলকাতার ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল।

পনের : খনিজ সম্পদ

পৃথিবীর ত্বক বা ভূত্বক (crust) তৈরি হয়েছে যে শিলা দিয়ে তারই ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের পরম প্রয়োজনের খনিজ সম্পদ, যা প্রতিদিন আমাদের হরেক রকমের চাহিদা মেটাচ্ছে। শুধু যে ভূত্বকেই রয়েছে খনিজ সম্পদ তা' নয়, ভূত্বকের নিচে ম্যানটেল কিংবা আরো নিচেও রয়েছে বেশ কিছু ধাতু ও খনিজ। কিন্তু অত গভীর থেকে তা' তুলে আনবার কায়দা কানুন এখনো রপ্ত হয় নি মানুষের। তাই আপাতত ভূত্বকের খনিজ নিয়েই খুশি থাকতে হচ্ছে আমাদের। ভবিষ্যতের কথা না হয় পরেই ভাবা যাবে। তোমরা কী বলো?

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে খনিজের একটা বিশেষ অবদান আছে। আসলে যেদিন থেকে আদিম মানুষ খনিজের ব্যবহার শিখেছে, সেদিন থেকেই মানব সভ্যতার শুরু। সভ্যতার আদি পর্বে যখন মানুষ খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করতে শেখে নি, সেই প্রস্তরযুগেও মানুষ পাথর ব্যবহার করেছে নানা দরকারে। কখনো শিকার, কখনো বা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। তারপর যেদিন মানুষ শিখল খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি, সেই দিনটি মানব ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

পণ্ডিতেরা বলেছেন, খুব সম্ভবত খ্রীস্টজন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মানুষ শিখেছে খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কায়দা। সেই প্রাচীন-কালেই মানুষ তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে তৈরি করেছে ব্রোঞ্জ। নবাপ্রস্তর যুগের পর এভাবেই শুরু হয়েছে ব্রোঞ্জের যুগ। আর তারপর থেকেই মানুষ এক

অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছে খনিজের সঙ্গে। ক্রমে গুহাবাসী মানুষ হয়েছে গৃহবাসী। নগর-সভ্যতা পত্তনের শুরুও সেই সময় থেকে।

তোমাদের জানা দরকার, নগর সভ্যতার পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পত্তন হয়েছে খনিজ সভ্যতারও। ধাতুর প্রয়োজনে যেমন দরকার হয়েছিল খননের, খননের জন্য তেমনি দরকার ছিল অভিজ্ঞ শ্রমিক। আর খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কাজে প্রয়োজন ছিল ধাতুমল বিদ্যার (metallurgy)। আর সেই ত্রিভুজ বিদ্যার মিলনে এগিয়ে চললো সভ্যতার রথ, সেকথা বোধ হয় না বললেও চলে। এই ব্যবস্থাকে ক্রমাগত চালিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজন হতে লাগল নতুন নতুন খনিজ ভাণ্ডারের। কারণ কেবলমাত্র গুটি কয়েক খনিজ ভাণ্ডার থেকে কোন সভ্যতাই অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। তাই সেই যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সব সময়ই চেষ্টা চলছে কীভাবে নতুন নতুন খনিজ ভাণ্ডার খুঁজে বের করা যায়।

ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিকদের মতে, সেই প্রাচীনযুগে যেসব জায়গায় এই খনিজ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, তার মধ্যে রয়েছে মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারত, গ্রীস ইত্যাদি দেশ। সেই খনিজ সভ্যতা আজো চলছে। শুধু তাই নয়, আরো ব্যাপকভাবে তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে।

ভূত্বক তৈরি হয়েছে যে পাথরে, তার মূল উপাদান কিন্তু খনিজ পদার্থ। সাধারণভাবে যে কোন পাথরের মধ্যেই থাকে দু'তিন ধরনের খনিজ, যদিও কেবলমাত্র একটি খনিজ দিয়ে তৈরি পাথরও বিরল নয়। যেমন জিপসাম, সৈন্ধব পাথর, মারবেল পাথর ইত্যাদি। তোমাদের মধ্যে যারা জব্বলপুরের দিকে বেড়াতে গেছো; তাদের নিশ্চয়ই মারবেল রকস্ দেখবার অভিজ্ঞতা হয়েছে। আবার অন্যদিকে, বেশির ভাগ খনিজের মধ্যেই থাকে দু'তিনটি মৌলিক পদার্থ, যদিও কিছু কিছু খনিজ, যেমন—গন্ধক, হীরা (কারবন), গ্রাফাইট (কারবন) ইত্যাদির মধ্যে রয়েছে একটি করে মৌলিক উপাদান।

প্রকৃতির বুকে যেসব খনিজের জন্ম ও যা মানুষের বহু প্রয়োজন মেটায় তার মধ্যে রয়েছে পেটরোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, বিভিন্ন ধাতুর খনিজ, চীনামাটি, চুনাপাথর, বক্সাইট ইত্যাদি। এছাড়াও উল্লেখ করতে হয় দামী মণিরত্নের কথা, যা আসলে প্রকৃতিজাত খনিজ।

পেটরোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস ঃ একথা কে না জানে, আধুনিক জীবনযাত্রায় পেটরোলিয়াম বা খনিজ তেলের গুরুত্ব অসাধারণ।

পেটরোল, কেরোসিন, ডিজেল বা নানা পেটরোকেমিক্যালস্ পাওয়া যায় পেটরোলিয়াম থেকে।

পেটরোলিয়াম কথাটি এসেছে ল্যাটিন থেকে—পেটরা মানে পাথর আর অলিয়াম বলতে বোঝায় তেল। সব মিলিয়ে পাথরের বুকে সঞ্চিত তেল।

মোটামুটিভাবে পেটরোলিয়াম বলতে খনিজ তেল বোঝালেও এর মধ্যে তিনটি ভাগ—(1) তরল বাদামী খনিজ তেল (2) প্রাকৃতিক গ্যাস ও (3) কালো চটচটে বিটুমেন টার ও পিচ।

পেটরোলিয়ামের জন্ম কী করে হলো? এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ বিতর্ক থাকলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় মতবাদটি হলো, সমুদ্রের নিচে পাললিক শিলার ভেতরে আদিম সামুদ্রিক প্রাণী ও গাছপালা থেকে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে পেটরোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস। কোনো কোনো বিজ্ঞানী (যেমন সোভিয়েত বিজ্ঞানী ড শাখিনিন ও আমেরিকার বিজ্ঞানী ড গোল্ড) অবশ্য বিশ্বাস করেন, পেটরোলিয়াম জন্মের ব্যাপারে সামুদ্রিক প্রাণী বা উদ্ভিদের কোন ভূমিকা নেই। এর সৃষ্টি অজৈব উপায়ে। ওদের মতে, পৃথিবীর শিলাস্তরে সঞ্চিত কারবাইডের সঙ্গে জলের প্রক্রিয়ার ফলেই পেটরোলিয়ামের জন্ম।

পৃথিবীর নানা দেশ যেমন সোভিয়েত রাশিয়া, সৌদি আরব, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, ভেনেজুয়েলা, মরক্কো, কুয়ায়েত, লিবিয়া, চীন ছাড়াও ভারতেও পেটরোলিয়াম পাওয়া যায়।

ভারতে পেটরোলিয়াম আবিষ্কারের কাহিনীটি প্রায় গল্পের মতো। 1889 সাল। তখন আসামে লিডো থেকে ডিবরুগড় পর্যন্ত রেললাইন পাতবার কাজ চলছে। কাজ করবার সময় একদিন আসাম রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোমপানির ইনজিনিয়াররা দেখতে পেলেন, ওদের এক হাতির পায়ের তলায় কালো চটচটে কী একটা জিনিস। নেহাতই কৌতূহলের বশে হাতির পায়ের দাগ ধরে ডোবায় পৌঁছলেন ওরা। আর সেই ডোবাতেই ছিল পেটরোলিয়াম বা খনিজ তেল। জায়গাটার নাম ডিগবয়। অবশ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এর চেয়ে প্রায় চল্লিশ বছর আগেই প্রথম তেলকূপ খনন করেছিলেন এডুইন ড্রেক।

কয়লা ঃ নাম তার কয়লা। তবে আদর করে লোকে বলে, 'ব্ল্যাক ডায়মণ্ড' অর্থাৎ কালো হীরে। সত্যিই কালো হীরে। আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার যুগে এর স্থান অনন্য। পেটরোলিয়ামের ব্যবহার ক্রমেই বাড়লেও এখনো পর্যন্ত

ভারতে শক্তি সরবরাহের ব্যাপারে কয়লাই এক নম্বর। কয়লার মূল ব্যবহার তাপ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে। এছাড়া ব্লাস্ট ফারনেসে ব্যবহারের জন্য 'কোক' তৈরির কাজেও প্রয়োজন কয়লার। তাছাড়া রাসায়নিক দ্রব্যও পাওয়া যায় কয়লার আংশিক পাতন থেকে।

কয়লার উৎপত্তি যে উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ থেকে, সব বিজ্ঞানীই তা' মেনে নিয়েছেন। তবে মতভেদ যা আছে, তা' হলো কোথায় কোন জলাশয়ে কীভাবে কয়লার জন্ম। সব কয়লারই জন্ম গণ্ডোয়ানা যুগে।

উদ্ভিদ থেকে ভৌত (Physical) ও রাসায়নিক (Chemical) পরিবর্তনের ক্রমিক পর্যায়ে যে বিভিন্ন ধরনের কয়লার উৎপত্তি, তা' চার রকমের। (1) পিট (peat)—ছিবড়ে জাতীয় কয়লা। রঙ বাদামী। ভালো করে লক্ষ্য করলে এর মধ্যে গাছপালার আঁশ বেশ চোখে পড়ে ; (2) লিগনাইট (lignite)—বাদামী রংয়ের জন্য এর আরেক নাম 'বাদামী কয়লা'। সহজেই ভেঙ্গে গুঁড়ো হয় বলে লিগনাইট থেকে 'ব্রিকেট' তৈরি হয় ; (3) বিটুমিনাস কয়লা (bituminous coal)—এই ধরনের কয়লার রং কুচকুচে কালো। এতে উজ্জ্বল আর ফ্যাকাশে—এই দু'ধরনের কয়লার পর পর অবস্থানের ফলে স্তরবিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের বেশির ভাগ কয়লাই এই জাতের ; (4) অ্যানথ্রাসাইট (anthracite)—এ জাতের কয়লা বেশ শক্ত। ধরলে হাত ময়লা হয় না। কাঁচের মতো বাঁকাভাবে ভেঙ্গে যায়। এই জাতীয় কয়লা থেকে বেশি উত্তাপ পাওয়া যায় আর ধোঁয়াও হয় না। তাই ধাতু নিষ্কাশনের কাজে এই জাতীয় কয়লার চাহিদা খুবই বেশি।

ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর যেসব দেশে কয়লা পাওয়া যায় তা' হলো পূর্ব ও পশ্চিম জারমানি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপান, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, চীন, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধাতুর খনিজ : সোনা, রূপা, তামা, সীসা, দস্তা, টিন, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম, টাংস্টেন ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় ধাতু প্রকৃতিতে পাওয়া যায় ধাতুর আকরিক হিসেবে। তবে সোনা ও রূপা কখনো কখনো নির্ভেজাল ধাতু হিসেবেই পাওয়া যায় পাথরের মধ্যে। অবশ্য আকরিকের চেহারায়ও এদের দেখা মেলে। আর এই সব আকরিকই প্রধানত মেলে আগ্নেয়শিলার মধ্যে। তবে লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের আকরিক পাললিক ও রূপান্তরিত শিলার মধ্যেও পাওয়া যায়। এইসব ধাতু যে মানুষের কী কী প্রয়োজনে লাগে তা' নিশ্চয়ই তোমরা জানো।

কয়েকটা ধাতুর প্রধান আকরিকের একটা তালিকা দিলাম নিচেঃ

তামা—চালকোপাইরাইট ($CuFeS_2$) সীসা—গ্যালেনা (PbS)

দস্তা—স্ফ্যালেরাইট (ZnS) টিন—ক্যাসিটেরাইট (SnO_2)

ম্যাঙ্গানিজ—পাইরোলুসাইট (MnO_2), সাইলোমিলেন ($MnO_2.H_2O$)

লোহা—হেমাটাইট (Fe_2O_3)

ক্রোমিয়াম—ক্রোমাইট ($FeO.Cr_2O_3$)

মলিবডেনাম—মলিবডেনাইট (M_oS_2)

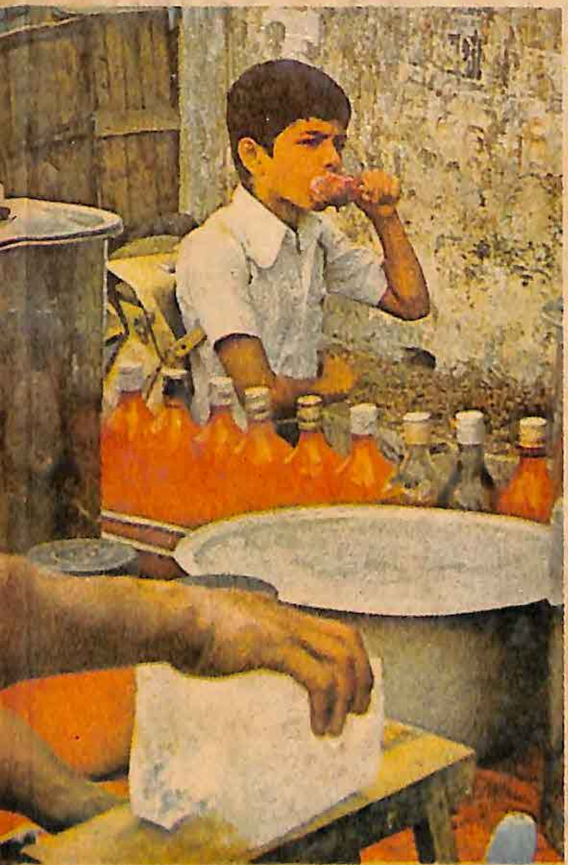
টাংস্টেন—উলফ্র্যামাইট ($(Fe, Mn)\ WO_4$)

হীরা, চুনি, নীলা, পান্না, পোখরাজ, বৈদূর্যমণি—এ সবই হরেক রকমের খনিজ। এদের জন্ম পাথরের বুকে কেলাসিত হয়ে। হীরার রাসায়নিক উপাদান বিশুদ্ধ কারবন বা অঙ্গারক। হীরার জন্ম কিমবারলাইট কিংবা পেরিডোটাইট পাথরে। রক্তবর্ণ চুনি আসলে কোরানডাম (corundum) নামের এক খনিজ। রাসায়নিক সংকেত Al_2O_3। পান্নাও আসলে বেরিল নামের খনিজ। রাসায়নিক সংকেত $3\ BeO.Al_2O_3.6SiO_2$। পোখরাজ বা টোপাজ খুবই মূল্যবান মণিপাথর।

কয়েকটি পরিচিত মণির ইংরেজি নাম দেওয়া হলো নিচে।

মাণিক্য—ruby
চন্দ্রকান্তমণি—moonstone
পোখরাজ—topaz
পান্না—emerald
চুনি—ruby
পুষ্পরাগ—topaz
ফিরোজা—turquois
পদ্মরাগমণি—ruby
সৌগন্ধিকা—spinel
হীরা—diamond
গোলাবী—rose red diomond
নীলবজ্র—blue diamond
বনস্পতি—green diamond
নীলা—blue sapphire
বৈদূর্যমণি—cat's eye
পারিভদ্র—aquamarine
গোমেদ—zircon
পিলু—jade
গন্ধর্ব—tourmaline
লাজোয়ার—lapis lazuli
পুলক—garnet
মোতি*—pearl
মুক্তা*—pearl
প্রবাল*—coral
বাসন্তী—yellow diamond

* জৈব মণি




কখনো ভেবেছেন কি?

ডঃ সুভাষ সান্যাল